বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই. ই.
লিখিত ভূমিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কলিকাতা
১৩৩৮

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস

১২০, [illegible]ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুত রাজশেখর বসুর

করকমলে

ভূমিকা

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি. আই. ই.

বাংলার লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমাজসংস্কারক বলিয়াই জানে। তিনি বিধবা-বিবাহ চালাইয়াছেন, বহুবিবাহ বন্ধ করিয়াছেন। তাহারা আরও জানে তিনি পড়ার বই নূতন করিয়া লিখিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন যে বাঙালীও ইংরেজের মত স্কুল-কলেজ করিয়া চালাইতে পারে, সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলাতেও পড়ানো যায়, সর্ব্বপ্রথম সুরুচিপূর্ণ বাংলা বই তিনিই লিখিয়াছেন। দানেও তিনি বীর ছিলেন,—১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষের সময় অনেক লোককে নিজে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া তাহাদের জীবন-রক্ষা করিয়াছেন। তিনি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, কেমন করিয়া গবর্ন্মেণ্টের চাকুরি পান, কেমন করিয়া সে চাকুরিতে তাঁহার উন্নতি হয় এবং ক্রমে তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল ও স্কুলের ইন্‌স্পেক্টার হন, এ সব কথা বাঙালীরা বড়-একটা জানে না, বড়-একটা খোঁজও লয় না। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে' সেই না-জানা কথাগুলি গবর্ন্মেণ্টের দপ্তর হইতে চিঠিপত্র দেখিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু অনেক বৎসর ধরিয়া গবর্ন্মেণ্টের দপ্তরে যাতায়াত করিতেছেন ও সেখানকার নথি দেখিয়া বর্ত্তমান ইতিহাসে বাঙালীর সম্বন্ধে অনেক না-জানা কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। গবর্ন্মেণ্ট রেকর্ড আপিসে বাহিরের লোককে বড় ঢুকিতে দিতে চান না; কিন্তু

ব্রজেন্দ্রবাবুকে তাঁহারা বিশ্বাস করেন, ব্রজেন্দ্রবাবুও কোন গোপন সংবাদ দেন না। বাঙালীরা যে-সকল সংবাদ পাইবার জন্য উৎসুক, অথচ পায় না, কেবল সেই সকল সংবাদই দেন। ব্রজেন্দ্রবাবু এইরূপে গবর্ন্মেণ্টের রেকর্ড হইতে বাঙ্গালীদের ইতিহাস বাহির করিয়া বেশ যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স এমন বেশী নয়। ইনি এই লাইনে আরও অনেক কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার চাকুরি-জীবনের সকল কথাই বলিয়াছেন। সংস্কৃত পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া তিনি প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার হন; সেখান হইতে তাঁহাকে আনিয়া তাঁহার মুরুব্বী মার্শাল সাহেব সংস্কৃত পাঠশালায় এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী করেন, কিন্তু সেক্রেটারী রসময় দত্তের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় ছয় মাসের মধ্যে পদত্যাগ করেন ও আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভাল চাকরি পান। দত্ত-মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুরা সেক্রেটারী হন (১৮৫১) এবং এক বৎসরের মধ্যে একখানি রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ন্মেণ্টে পাঠান; সে রিপোর্টের ফলে সংস্কৃত পাঠশালা কলেজ হইয়া যায়। তাহাতে কথা থাকে—তিন ভাগের দুই ভাগ সংস্কৃত ও এক ভাগ ইংরেজী পড়িবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরাই বাংলা লিখিবে; সংস্কৃত ভাল না জানিলে সে লেখক দ্বারা বাংলার উন্নতি হইতে পারে না। সেই রিপোর্টের ফলে তিনিই সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ইংরেজী সাহিত্যের ও ৺শ্রীনাথ দাস ইংরেজী অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পূর্ব্বে যে পাঠশালা ছিল, তাহার এক এক ঘরে এক এক জন সংস্কৃত অধ্যাপক বসিতেন, ছেলেরা তাঁহার কাছে পড়িতে যাইত। প্রথম ব্যাকরণের ঘরে পড়িত, তারপর সাহিত্যের ঘরে, তারপর অলঙ্কারের ঘরে, তারপর স্মৃতির ঘরে, তারপর ন্যায়ের ঘরে; কেহ কেহ জ্যোতিষের

ঘরেও পড়িত। প্রথম বার বছর ধরিয়া (সংস্কৃত পাঠশালায়) একটি বৈদ্যকেরও ঘর ছিল। সেখানকার অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলে পদত্যাগ করিয়া সেখানে পড়িতে যান এবং প্রথম ছুরি দিয়া মড়া কাটেন। প্রথম যেদিন তিনি ছুরি ধরেন, সেদিন নাকি তোপ হইয়াছিল। মধুসূদন পদত্যাগ করিলে বৈদ্যকের ঘর উঠিয়া যায়। বলিতে গেলে, সংস্কৃত পাঠশালায় বৈদ্যকের ঘর হইতেই মেডিকেল কলেজের সৃষ্টি। যাহারা বৈদ্যকের ঘরে পড়িত, তাহাদের একজন সাহেবের কাছে কেমিষ্ট্রি পড়িতে হইত, আর মরা পশুর দেহ কাটিয়া এনাটমি শিখিতে হইত; কিন্তু সাহেবের ঘর কলেজের বাড়িতে ছিল না; তাহার জন্য স্বতন্ত্র বাড়িভাড়া করিতে হইত। বৈদ্যকের ঘরের সঙ্গে সঙ্গে কেমিষ্ট্রি এনাটমিও উঠিয়া গেল।

১৮৫২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল হইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই গবর্ন্মেণ্টের মতলব হইল দেশে বাংলা-শিক্ষা চালানো। দক্ষিণ-বাংলার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইলেন। তিনি যখন ইন্‌স্পেক্টারের কাজ করিতে যাইতেন, তখন একজন ডেপুটী-প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজ করিবার ক্ষমতা অসীম ছিল। ইন্‌স্পেক্টারের কাজেও তাঁহার খুব যশ ও সুখ্যাতি হইল। তিনি গবর্ন্মেণ্টের একজন প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মাথা বেশ পরিষ্কার ছিল। তিনি হাতে-কলমে নিজে কাজ করিতেন বলিয়া অনেক জিনিষ তাঁহার উপরওয়ালার চেয়ে ভাল বুঝিতে পারিতেন। ক্রমে তাহাই লইয়া খুঁটিনাটি আরম্ভ হইল; আর গবর্ন্মেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইন্‌স্পেক্‌শনের কার্য্য সংক্ষেপ করিয়া দিলেন। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাল লাগিল না — তিনি পদত্যাগ করিলেন। গবর্ন্মেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন—তুমি থাক; কিন্তু তিনি থাকিলেন না। বাংলার প্রথম লেফটেন্যাণ্ট-গবর্ণর

হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়া তাঁহার পদত্যাগ-পত্র ফিরাইয়া লইতে বলিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—যে-কার্য্য তিনি মন দিয়া করিতে পারিবেন না, শুধু টাকার জন্য সে-কার্য্য করিতে তিনি রাজী নন। হ্যালিডে সাহেব বলিলেন—আমি জানি তুমি সব দানধ্যান কর, কিছুই রাখ না। সাত শত টাকা মাহিনার চাকুরি ছাড়িয়া খাইবে কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—ডাল-ভাত। সাহেব বলিলেন—তাই বা পাইবে কোথা থেকে? তিনি বলিলেন—এখন দুবেলা খাই, তখন না-হয় একবেলা খাব; তাও না জোটে, একদিন অন্তর খাব। তাই বলিয়া যে-কাজে মন বসিতেছে না, সে কাজ করিয়া টাকা লইতে আমি চাই না।*

বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট যখন যে-বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাহিতেন, তিনি বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরামর্শ দিতেন। সেজন্য গবর্ন্মেণ্টে তাঁহার খুব খাতির ছিল। ১৮৮০ সালে গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই উহার বাংলা পরিবর্ত্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি (১৮৪৭) নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া ছাপাইয়া

---

*এ কথাগুলি আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজমুখে শুনিয়াছি।

লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন। এই সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী তাঁহার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে; ইহা এখনও বর্ত্তমান আছে;—কিন্তু উহার হিসাব রাখার নিয়ম খুব সুন্দর, যখনই যাও, আগের মাস পর্য্যন্ত যত বই বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব পাইবে এবং চাহিলেই তোমার যা পাওনা তাই দিয়া দিবে।

সাংসারিক কাজে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির আর একটি উদাহরণ দিব। বিদ্যাসাগর দেখিতেন—বাড়ির রোজগারী পুরুষ মরিয়া গেলে বিধবার এবং বিধবার ছেলেপুলের বড়ই কষ্ট হয়; তাই তিনি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিয়া হিন্দু ফ্যামিলী এ্যানুইটি ফণ্ডের সৃষ্টি করেন (১৮৭২)। স্বামী যতদিন জীবিত থাকিবেন—মরিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য কিছু কিছু টাকা ফণ্ডে দিবেন; তিনি মরিয়া গেলে ফণ্ড মাসে মাসে স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন তাঁহাকে একটা মাসহারা দিবেন। এইরূপে ভদ্রঘরের কত বিধবা যে এই ফণ্ডের মাসহারা লইয়া জীবন-ধারণ করিতেছেন, তাহা বলা যায় না। তিনি ফণ্ডের এমন বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং এই ষাট বৎসরে এত টাকা জমিয়া গিয়াছে যে তাহার সুদ হইতে ফণ্ডের সমস্ত খরচ চলিয়া যায়, এবং মাসিক চাঁদা সমস্ত জমিয়া যায়। এইরূপে অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছে। মূল টাকা গবর্ন্মেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার হাতে থাকে। এ ফণ্ড ফেল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক কীর্ত্তি সোমপ্রকাশ। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতেন—যে-সকল বাংলা কাগজ ছিল, তাহাতে নানা রকম খবর দিত; ভাল খবর থাকিত, মন্দ খবরও থাকিত। লোকের কুৎসা করিলে কাগজের পসার বাড়িত, অনেক সময় কুৎসা করিয়া তাহারা পয়সাও রোজগার করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যদি কোনো কাগজে ইংরেজীর মত রাজনীতি চর্চ্চা করা যায়, তাহা

হইলে বাংলা খবরের কাগজের চেহারা ফেরে। তাই তাঁহারা কয়েকজন মিলিয়া সোমপ্রকাশ বাহির করিলেন ;—সোমবারে কাগজ বাহির হইত বলিয়া নাম হইল সোমপ্রকাশ। যাঁহারা কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহারা শেষ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে কাগজের ভার দিয়া সরিয়া পড়িলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাগজের সম্পাদকতা করিয়া অনেক অর্থ ও সম্মান উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যখন ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সরকার কাগজ বন্ধ করিয়া দেন, তারপর অনেকে ধরিয়া-করিয়া কাগজখানিকে আবার খুলিয়া লন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যত বই লিখিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার এক তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস'ও ছাড়েন নাই, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'ও ছাড়েন নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় বড় দুইখানি বইয়ের নাম তিনি করেন নাই। একখানির নাম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য, ১ম ভাগ', আর একখানির নাম 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য, ২য় ভাগ।' বহুবিবাহ লইয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতি খুড়োর সঙ্গে তাঁহার খুব বিচার চলে, সেই সময়ে 'ভাইপোস্য' বাহির হয়। তখন কলিকাতার লোক এই বই দুখানি পড়িয়া হাসিয়া অস্থির হইত। খুড়োও ছাড়েন নাই, তিনিও জবাব দিতেন, একটা জবাবের নাম—'লাঠি থাকিলে পড়ে না।' কিন্তু হার খুড়োরই হইল ; খুড়ো লিখিতেন সংস্কৃতে ; বিদ্যাসাগর লিখিতেন বাংলায় ; খুড়োর বই কেউ বুঝিতে পারিত না, বিদ্যাসাগরের বই সবাই পড়িত।

কর্ম্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর

'কর্ম্মাটাঁড়' শব্দের অর্থ—করমা নামে একজন সাওতাল মাঝি ছিল, তাহার টাঁড় অর্থাৎ উঁচু জমি যাহা বন্যায়ও ডুবিয়া যায় না। এখন

কর্ম্মাটাঁড়ে একটি ই. আই. আর. লাইনের এই ষ্টেশন হইয়াছে। উহা জামতাড়া ও মধুপুর ষ্টেশনের মধ্যে। ১৮৭৮ সালে ষ্টেশনের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলা ছিল। বাংলাটিতে দুটি হল, চারটি ঘর ও দুটি বারাণ্ডা ছিল; বাংলার চারিদিকে একটি চারচৌরশ জমি, চার-পাঁচ বিঘা হইবে,—সেইটি বাগান; বাগানটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা দেশ হইতে আঁবের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি লতানে আঁব গাছ ছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় গাছগুলির বিশেষ যত্ন করিতেন। বাগানে আরও নানা রকমের গাছ ছিল। বাগানের বাহিরে গোটাকতক সেকেলে অশ্বত্থগাছ ছিল। তখনকার ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় ওখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন—I am the monarch of all I survey—বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মাটাঁড়ে যাওয়ায় তাঁহার আধিপত্যের একটু ক্ষতি হইয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সুনজরে দেখিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন কিছু হইল না, তখন তিনি নন্-কোঅপারেশন করিয়া বসিলেন।

আমি ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ যাই। এখানে আমার সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া জ্বর হইত; সেইজন্য লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রফেসারের একটিনি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু যাইবার আট-দশ দিন পূর্ব্বে আমার ভয়ানক জ্বর হয়, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখি—আমি একটানা লক্ষ্ণৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে একদিন থাকিয়া যাইব। ঠিক দিনে পৌঁছিবার আশায় আমি পথ্য করিয়াই যাত্রা করি; আমার সঙ্গে আমার গ্রামের মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একটি ছেলে ছিল; তাহারও ম্যালেরিয়া জ্বর, তাই তাহার বাপ আমার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা কর্ম্মাটাঁড়ে পৌঁছিয়া আমাদের মালপত্র ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলায় গেলাম। প্ল্যাটফরমের নীচেই বাংলা, বাগানের গেটে ঢুকিতেই দেখি, তিনি বাংলার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা গিয়া প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এটি কে? আমি পরিচয় দিলে তিনি বলিলেন—আমি উহাদের খুব চিনি। ও যে তোমার সঙ্গে এত অল্প বয়সে এতদূর কেমন করিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। তিনটার পর গাড়ি পৌঁছিয়াছিল;—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল। তিনি আমার বাড়ির প্রত্যেকের খবর নিলেন, আমিও তাঁহার অনেক খবর লইলাম। আমি লক্ষ্ণৌয়ে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি—এম্. এ. ক্লাসেও পড়াইতে হইবে—বিশেষ হর্ষচরিতখানা পুরা পড়াইতে হইবে—শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন—বইটা বড় কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্ম্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। বলিলেন—বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম—রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলেন—ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। তিনি বলিলেন—তাই ত, রাজকুমার এতবড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাঁচাপাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে?—যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষচরিত এবং অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল। আহারাদির পর রাত্রে শুইবার সময় তিনি আমার ঘরে আসিলেন এবং স্বহস্তে যে-কটি জানালা ছিল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবিকুলুপ লাগাইয়া দিলেন এবং একটি চাবিকুলুপ আমার হাতে দিয়া বলিলেন—তুমি দরজাটিও চাবি বন্ধ করিয়া শুইবে, এখানে বড় চোরের ভয়।

পরদিন সকালে তালা খুলিয়া আমি ও সতীশ বাহির হইলাম। বাহির হইয়া যে-ঘরে পড়িলাম—দেখিলাম তাহার চারিদিকে ব্রাকেটের ওপর তাক, তাকের নীচে এক জায়গায় দেখি—এক হাঁড়া মতিচুর ও এক হাঁড়া

ছানাবড়া, বোধ হয় বৰ্দ্ধমান হইতে আমদানি হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বারাণ্ডায় পাইচারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে টেবিলে বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন। প্রুফে বিস্তর কাটকুট করিতেছেন। যেভাবে প্রুফগুলি পড়িয়া আছে, বোধ হইল, তিনি রাত্রেও প্রুফ দেখিয়াছেন। আমি বলিলাম—কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন, আর রাত জেগেই বা দেখেন কেন? তিনি বলিলেন—ভাষাটা এমনি জিনিষ, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না; যেন আর একটা শব্দ পাইলে ভাল হইত;—তাই সর্ব্বদা কাটকুট করি। ভাবিলাম—বাপ রে, এই বুড়া বয়সেও ইঁহার বাংলার ইডিয়মের ওপর এত নজর।

রৌদ্র উঠিতে-না-উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার এই ভুট্টাকটা নিয়া আমায় পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টাকটা লইলেন ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল,—তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল—আমার আট গণ্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় আটগণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম—বাঃ, এ ত বড় আশ্চর্য্য! খরিদ্দার দর করে না, দর করে যে বেচে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন, তারপর দেখি—যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেন—দেখ্‌বি রে দেখ্‌বি।

এইরূপ ভুট্টা কেনা চলিতেছে, ইতিমধ্যে দুটা কুড়ি-বাইশ বছরের সাঁওতাল ছুঁড়ি আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের কিছু খাবার দে। তাহারা উঠানে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই রকে উঠিল না। আমি বলিলাম—ওরা খাবার চাচ্ছে, আপনার এত মতিচুর ছানাবড়া রহিয়াছে, দু-একটা দেন না। তিনি বলিলেন—দূর হ’, ওরা কি ওর স্বাদ জানে, না রস জানে? দিলে টপ্ টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিবে। ওদের খাবার হইলেই হইল, ভালমন্দ খাবার ওরা বোঝে না। ওর জন্যে আবার আর এক রকমের লোক আছে। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে কোরা বলিয়া এক গ্রাম আছে, সেখানে এক মারহাট্টা রাজা আছে। বারগীর হাঙ্গামার সময় এইখানে উহারা একটি ছোটখাট রাজত্ব করে। এখনও সেখানে অনেক মারহাট্টা আছে; ব্রাহ্মণও আছে, অন্য জাতও আছে। কিন্তু সাঁওতালের সঙ্গে থেকে সাঁওতালের মত হইয়া গিয়াছে। তাদের কেবল ভাল খাবার দিলে তারা এক কামড় খাইয়া দেখে, পরীক্ষা করে; কি কি জিনিষে তৈরি জিজ্ঞাসা করে, কোথা থেকে আনানো হয়েছে; তখন আমি বুঝিতে পারি, এদের জিব আছে; আর এই এদের কিছুই নেই। মুড়ি চিঁড়াও যেমন খায়, সন্দেশ রসগোল্লাও তেমনি খায়।

আমার কথায় মতিচুর ছানাবড়া দিলেন না দেখিয়া আমি বলিলাম—তবে আমি এক কাজ করি, আমার সঙ্গে কতকগুলা পরশু-ভাজা লুচি আছে, আমি সেগুলি ইহাদিগকে দিয়া দি! তিনি বলিলেন—তোর সঙ্গে আছে নাকি? কই, দেখি। আমি দৌড়িয়া ষ্টেশনে গিয়া পোঁটলা খুলিয়া কলাপাতায় বাঁধা প্রায় দুদিস্তা লুচি লইয়া আসিলাম। বলিলাম—দুদিন বাঁধা আছে, কলাপাতাগুলা সেদ্ধ হইয়া গিয়াছে, লুচিতেও কলাপাতার গন্ধ হইয়াছে। বলিয়াই সেগুলা ঐ ছুঁড়িদের দিতে যাইতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—আমায় দে, ওদের কি অমন ক’রে দিতে আছে? বলিয়া

লুচিগুলি লইয়া কলাপাত খুলিয়া একটু হাওয়ায় রাখিয়া বলিলেন—এই দেখ্ কিছু গন্ধ নেই। তার পর মাঝখান হইতে চারখানা লুচি লইয়া বেশ সাবধানে তুলিয়া রাখিলেন। আমি বলিলাম—আপনি ও কি করছেন? তিনি বলিলেন—খাবো রে। তোর মায়ের হাতের ভাজা? আমি বলিলাম—না বড়বউয়ের। তিনি বলিলেন—তবে আরও ভাল। নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বিধবা পত্নীর? নন্দ আমার বড় প্রিয়পাত্র ছিল। তার পর উপর হইতে দুখানি লুচি তুলিয়া সাঁওতালনীদের দিলেন। তারা টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন—দেখ্লি, ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে?

ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি—বিদ্যাসাগর নেই। সব ঘর খুঁজিলাম—নেই, রান্নাঘরে নেই, বাগান সব খুঁজিলাম নেই, শেষ বাগানের পিছন দিকে একটা আগড় আছে—সেটা খোলা; মনে করিলাম, এইখান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন; সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আল্‌পথে বিদ্যাসাগর মহাশয় হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। আমাকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কেন? আমি বলিলাম—আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওরে খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—বিদ্যে-সাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস্। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি ক'রে নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম—এক ডোজ ওষুধে তার রক্ত-পড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা ত মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না। আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম—কতদূর গিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন—ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব হাঁটিতে পারিতেন।

বাংলায় আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো - সব রকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কোনো দলে পাঁচ জন, কোনো দলে আট জন, কোনো দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলা শুকনা পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা সেই শুকনা কাঠ ও পাতায় আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা সেঁকে, আর খায় ;—ভারী ফুর্ত্তি। আবার চাহিয়া লয়—কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহং চারটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল—খুব খাইয়েছিস্ বিদ্যেসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন ; আমিও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম ; ভাবিলাম এ রকম বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না।

তাহারা চলিয়া গেলে, বিদ্যাসাগর আমাদের স্নানাহার করাইলেন। বিদ্যাসাগর কখন যে কি খাইলেন এবং কোথায় খাইলেন আমরা তাহা কিছুই টের পাইলাম না। বারটার পর আমরা তাঁহার টেবিলে আসিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন—তোর জন্যে আমার একটু ভয় হয়েছে। তুই লক্ষ্ণৌয়ে পড়াইতে যাইতেছিস্, পারবি কি ? আমি বলিলাম—কেন, কিছু ভয়ের কারণ আছে না-কি ? তিনি বলিলেন—আছে বইকি। সেখানে পুনো জ্যাঠা বলিয়া এক বাঙালী ছেলে আছে ; আমি যখন লক্ষ্ণৌয়ে গিয়েছিলাম, তখন সে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। আমি যে-কদিন ছিলাম, রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাড়িতেই ছিলাম, রাজকুমারও আমাকে

খুব যত্নে রাখিয়াছিল। অনেকে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, অনেকে শুধু দেখিতে আসিতেন।একদিন পূর্ণচন্দ্র আসিয়া হাজির। আসিয়াই বলিল—রাজকুমারবাবু, এখানে ত অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর কোন্‌টি? রাজকুমার আমায় দেখাইয়া দিলে সে বলিল—ওমা, এই বিদ্যাসাগর। উড়ে-কামানো-কামানো, পাল্কীর নীচে গেলেই হয়। তাহার বক্তৃতায় রাজকুমার ত অধোবদন, আমিও কতকটা তাই। তারপর কিছু আলাপচারী করিয়া আমায় বলিল—বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপনি ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির সিনিয়ার ফেলো, কিন্তু এটা হয় কেন বলুন দেখি। যে-ছেলেটা সেকেন ক্লাস থেকে বা'র হয়ে যায়, সেও লেখে I has; যে এণ্ট্রেন্স পাস করে, সেও লেখে I has; যে এল্. এ. পাস করে, সেও লেখে—I has; যে বি. এ. পাস করে, সেও লেখে I has; যে এম্. এ. পাস করে, সেও লেখে—I has; এ জিনিষটা কেন হয়? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত ইউনিভারসিটির মা-বাপ। এইখানে বলিয়া রাখি যে সে-সময় লাহোর ছাড়া উত্তর-ভারতে আর ইউনিভারসিটি ছিল না। আগরা হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির অধীন ছিল, নাগপুরও ছিল, সিলোনও ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—আমি দেখিলাম পুনোর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করা ত আমার কাজ নয়; আমি তাহাকে বলিলাম—পূর্ণবাবু, এটি বুঝাইবার জন্য আপনাকে দুটি গল্প বলিব। মনোযোগ দিয়া শুনুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কেন এরূপ হয়।

প্রথম গল্প।—আপনি জানেন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দুস্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত; আমরা দেখিতাম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা কতকগুলি উপর-ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প

পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট-দশ ছিটে পর্য্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম; তখন আমাদের একটা সখ হইল—বাগবাজারের আড্ডায় গিয়া বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব। আট মূর্ত্তি সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলাম; বাগবাজারে গুলির আড্ডায় যাইতে গেলে একটি গলির মধ্যে দিয়া যাইতে হয়, গলির সুমুখেই আড্ডার দরজা। আমরা গলির আর এক মুড়ায় ঢুকিতেই আড্ডাধারী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন এতগুলো ফরসা কাপড়ওয়ালা লোক আসিতেছে, আমার বুঝি আজ কপাল ফিরিবে। আমরা কাছে গেলে খুব আদর করিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম একটি খোলায়-ছাওয়া হল, তার কিন্তু ওই একটি দরজা, পাছে গুলিখোররা পয়সা না-দিয়া পালায় সেইজন্য ওই একটি দরজা রাখা হইয়াছে, আড্ডাধারী সেইখানে থাকেন। আমাদের কিন্তু আড্ডাধারী খুব খাতির করিলেন। আমরা যতক্ষণ ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। দেখিলাম প্রায় দুশো আড়াইশো গুলিখোর বসিয়া আছে; সকলেরই সাম্‌নে একটা কল্‌সীর কানা, তার উপর একটা থেলো হুঁকো, নল্‌চেটি ছোট, নলটা খুব লম্বা; নল্‌চের উপর একটা কলিকা, কিন্তু উপরভাগটা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। গুলিখোরেরা সেই ভাঙা কলিকার উপর ছিটা বসাইতেছে, চিমটা করিয়া আঙরার কয়লা তার উপর দিতেছে, নল দিয়া টানিয়া সেই ধোঁয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছে ও এক-একবার একটু একটু চাট মুখে দিতেছে। এ চাট আর কিছু নয়,—সামনে মাল্‌সায় একটু গুড়ের জল আছে ও তাহাতে এক টুকরা সোলা ফেলা আছে। ধোঁয়া টানিয়াই এই সোলাখানা চুষিতেছে। আমরা দেখিলাম—হলের পূব দিকে সবাই মাটিতে বসিয়া গুলি খাইতেছে, উত্তর দিকেও তাই, পশ্চিম দিকেও তাই। কেবল দক্ষিণ দিকে যাহারা গুলি খাইতেছে, তাহারা ইটের উপর বসিয়া আছে।

আমরা আড্ডাধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা ইটের উপর বসিয়া আছে কেন? তিনি বলিলেন—আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই যে, যে-কেহ একটানে ১০৮টা ছিটে খাইতে পারিবে, তাহাকে একখানা ইট দেওয়া হইবে। কথাটা শুনিয়াই আমাদের যে উচ্চ আশা ছিল, তাহা একেবারেই উপিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—ওই যে একজন লোক আটখানা ইটের ওপর বসিয়া আছে, ও কত ছিটে খাইতে পারে? আড্ডাধারী বলিল—৮৬৪। আমাদের সকলের মুখ পাঙ্গাস বর্ণ হইয়া গেল। মদন আমার কানে কানে বলিল—টক্কর দেওয়া ত হ'ল না, কিন্তু একবার এইসব গুলিখোরেরা কি গল্প করে শোনা যাক্। তাই আমরা তাহাদের কাছ ঘেঁষিয়া গেলাম। পাছে ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়, সেইজন্য গুলিখোরেরা অতি আস্তে আস্তে কথা কয়, হাত-পা নাড়িয়াই কথা কওয়ার কাজ সারে। তাই আমরা খুব কাছে গেলাম। শুনিলাম তাহারা কলের গল্প করিতেছে।

যে একখানি ইটের উপর বসিয়াছিল, সে বলিতে লাগিল—চাণক চাণক। গোল করাত—মস্ত গোল, তার ওপর বাহাদুরি কাঠ ফেলিয়া দিতেছে; ফর ফর ফর ফর করিয়া কাঠ চিরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়ি, কোথাও বরগা, কোথাও দোর, কোথাও জানালা, কোথাও টেবিল, কোথাও কোচ, কোথাও কেদারা—এই সব বাহির হইতেছে।

যে দুখানা ইটের উপর বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিল—ও কি কল! কল ত গরফের। একখানা পাথরের বারকোশ—মস্ত—ঘর-জোড়া, তার ওপর দুখানা মোটা পাথরের চাকা আড়ে ঘুরিতেছে। আর সাহেবরা বস্তা বস্তা মসিনা সেখানে ফেলিয়া দিতেছে; কলের দুটো মুখ, একটা দিয়া পিপে পিপে তেল বাহির হইতেছে, আর একটা দিয়া থান থান খোল বাহির হইতেছে।

তিনখানা ইটের ওপর যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—ও-বা কি কল! আক্‌ড়ায় দেখিলাম—পাঁজায় পাঁজায় মাঠ ছাইয়া গিয়াছে, কলের ভেতর সেই ইট ঢোলাই করিয়া দিতেছে। কলের সামনে এক আকাশপাতাল ছাঁক্‌নি। কলের গুঁড়া গিয়া তার উপর পড়িতেছে। কোথাও ১ নং, কোথাও ২ নং, কোথাও ৩ নং সুরকী, কোথাও কুরুই পড়িতেছে।

বিদ্যাসাগর বলিলেন—পূর্ণচন্দ্র, সব গুলিখোরের গল্প দিয়া আমি আর তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না, শেষ গল্পটা* দিয়াই তোমার কথার জবাব দি। যিনি আটখানা ইটের ওপর বসিয়াছিলেন, তিনি কথা না কহিয়াই হাত ঘুরাইয়া বলিয়া দিলেন—ওসব কল কিছু না। তিনি বলিলেন—আমার বাড়ি ফরাসডাঙ্গা। বাড়ি গিয়া দেখি কোথাও বাড়ি নাই, ঘর নাই, পুকুর নাই, গাছ নাই, পালা নাই, সব মাঠ হইয়া গিয়াছে। ছিরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্য্যন্ত সব ধূ ধূ করছে মাঠ। ছিরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুরঙ্গ আর চুঁচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একটা সুড়ঙ্গ; একটা দিয়ে পালে পালে পালে গরু যাইতেছে, আর একটা দিয়া গাড়ি গাড়ি গাড়ি আক যাইতেছে; মাটির ভিতর কোথায় যায়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনেক খুঁজিয়া বুঝিলাম—মাটির ভিতরে কল আছে, কলের ১০০টা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়া বাহির হইয়াছে। কোনটা দিয়া রাতাবী, কোনটা দিয়া মনোহরা, কোনটা দিয়া কাঁচাগোল্লা, কোনটা দিয়া রসগোল্লা, কোনটা দিয়া ছানাবড়া, কোনটা দিয়া পানতুয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখ সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরি কি না!

বিদ্যাসাগর বলিলেন—তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যে-সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাখা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি,—দেখাইয়া দিই,

এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এণ্টেন্স হইয়া, কেহ এল্. এ. হইয়া, কেহ বি. এ. হইয়া, কেহ বা এম্. এ. হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has ; এক পাকের তৈরি কি না !

দ্বিতীয় গল্প।—পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আপনারা যে ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেন, নানারকম ফি নেন, বই, কাগজ, খাতাপত্র ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট বক্স, রঙের বাক্স—এই সব কেনান, তাদের শেখান কি ?—দেন কি ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—পূর্ণবাবু, আপনি কখনও আমাদের দেশে যান নাই। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বন্যা হয় ; ঘর-বাড়ি, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার বাগান-বাগিচা—সব জলে জলময় হইয়া যায়। সেই সময়ে যারা আমাদের গ্রাম থেকে ঘাটালে যায়, তারা আপনি যা বললেন তার মর্ম্ম জানে। সব ত জলে জলময়,—কেবল মনের আট্‌কালে রাস্তাটা কোথা দিয়ে ছিল—তারা তাই আঁচিয়া লয় এবং সেই রাস্তায় চলিতে থাকে। পায়ের তেলো সর্ব্বত্রই ডুবিয়া যায়। ডাঙ্গাজমি দেখা যায় না। তার ওপর কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমর-জল ; মাঠে এর চেয়ে বেশী জল হয় না ; এই জল কাটাতে কাটাতে প্রায় চার ক্রোশ গিয়া তারা একটা বাঁশের টং দেখিতে পায়—জল ছাড়া প্রায় বিশ হাত উঁচু। টঙে ঘাটমাঝি-মশাই বসিয়া আছেন, একখানা মই তাতে লাগানো। অনেক কষ্টে টঙের কাছে আসিয়া সে মাঝিকে বলিল—মাঝি, আমায় পার ক'রে দাও। সে বলিল—মশাই, আপনি ওপরে আসুন। ওপরে আসিলে সে বলিল—পারের কড়ি রাখুন। অন্য সময়ে যাহা রাখেন

তার আটগুণ রাখিতে হইবে। বেচারা কি করে, তাই রাখিল। তখন ঘাটমাঝি বলিল—ওই দেখিতেছেন নৌকা আছে; নৌকায় বোটে আছে, দাঁড় আছে, হাল আছে, লগি নাই; বন্যার সময় নদীতে লগি দিয়া থাই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে বাইতে ওই ওপারে চলিয়া যান। ওপারে যে টঙ দেখিতেছেন, উহার কাছে নৌকা রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান।

আমরা সেই ঘাটমাঝির মত টঙ বাঁধিয়া বসিয়া আছি। ছেলেরা পড়িতে আসিলে তাদের কাছ থেকে নানারকম ফি আদায় করিয়া বলি—ঐ স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, মাষ্টার আছে, পণ্ডিত আছে, কাগজ কলম বই কিনিয়া পড় গে। মাসে মাসে আমার এখানে ফি-টি দিয়া যাইও।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প শেষ হইতে হইতেই ষ্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল, বুঝা গেল আমাদের গাড়ি আসিতেছে। আমরা উঠিয়া ষ্টেশনের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম, মনে করিলাম এদিনের ব্যাপারটা চিরদিনই আমাদের মনে গাঁথা থাকিবে। আমরা যেন কোনো মহিষর আশ্রম হইতে বাহির হইতেছি। দেখুন, প্রায় বাহান্ন বছর পরেও সেদিনের কথা আমার কেমন মনে আছে।

রুইমাছের মুড়ো

আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম খুব শুনিয়াছি। পূজোর সময় শান্তিপুরের কাপড় পাইতাম, তাহার পাড়ে লেখা থাকিত "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।" দাদারা যে-সব বই পড়িতেন, তাতে প্রায়ই লেখা থাকিত "শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।" বাড়িতেও প্রায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম হইত।

একদিন সকালে উঠিয়াই শুনি মেয়েমহলে খুব সোরগোল উঠিয়াছে—"ওমা এমন ত কখনও শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুই মাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে!" কেউ বলিল—ঘোর কলি! কেউ বলিল—সব একাকার হ'য়ে যাবে; কেউ বলিল—জাতজন্ম আর থাকবে না। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে কেড়ে খেয়েছে?, মা বলিলেন—জানিস্ নি? বিদ্যেসাগর। আমি জিজ্ঞেস করলুম—তিনি কি এখানে এসেছেন? মা বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—কাল থেকে এসেছেন।

বাড়ির পুরুষদেরও দেখিলাম সব মুখ ভার। কেউই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ ব্যবহারটা পছন্দ করেন নাই। না-করিবারই কথা। কেন-না সেই বৎসরই প্রথম বর্ষায় একদিন আমার দাদা, আমার নূতন ভগ্নীপতি এবং আমার এক জ্যেঠতুত ভাই—তিনজনে গোয়ালঘরে লুকিয়ে মুসুর ডালের খিচুড়ি রেঁধে খেয়েছিলেন—এই অপরাধে বাড়ির বুড়োকর্ত্তা তিনজনকেই বাড়ি থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেন;—তারা এক প্রতিবেশীর বৈঠকখানায় শুইয়া থাকিত; বাড়ি থেকে ভাত বহিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া আসিতে হইত। ক্রমে মা'র অত্যন্ত সাধ্যসাধনায় বুড়োকর্ত্তা বৈধ গঙ্গাস্নান করাইয়া আমার ভগ্নীপতিকে প্রায় পনর দিন পরে বাড়ি আসিতে দিলেন। বাকী দুজনের আরও ১৫ দিন লাগিয়াছিল। সে-বাড়ির লোকে মেয়ে-পুরুষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ব্যবহারে যে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন, সে কথা কি আর বলিতে!

যাহা হউক, সেইদিন বৈকালে বাবা টোলে যান নাই, বাড়ির একটা ছাতে বসিয়া পুঁথি দেখিতেছিলেন; আমরাও ছাতে খেলা করিতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম—দু'জন ভদ্রলোক বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। একজনের গায়ে ধবধবে বিছানার চাদর, পায়ে তালতলার চটী, গায়ে একটা চৌ-বন্দি হাতকাটা ফতুয়া। শুনিলাম ইনিই বিদ্যাসাগর। সঙ্গের লোকটি কে—সে খবর পাইলাম না। বাবা

তাঁহাদিগকে এক একটি মাদুর পাতিয়া দিলেন, তাঁহারা বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা গল্প করিলেন। কত কি কথা হইল, আমরা বড়-কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দুটি ঘরের দরজা দিয়া ছাতে যাওয়া যাইত। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যাসাগরকে দেখিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হব-হব সময় তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। শুনিলাম তিনি অমৃতলাল মিত্রের বৈঠকখানার পাশে বাঁড়ুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে স্কুল বসাইয়া গিয়াছেন।

অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট'

১৮৮৮ কি ৮৯ সালে আমি একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি একাই আছেন। তখন তিনি বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে নিজ বাড়িতেই থাকেন। বাড়ির উত্তর দিকে দোতলাতে যে তিনটি ঘর ছিল, তাহার পশ্চিমের ঘরে তিনি বসিয়া ছিলেন। কথা উঠিল—বঙ্কিম বেশী সংস্কৃত লেখেন, না বিদ্যাসাগর লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—বারাসতে কালীকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ি একদিন এই কথা উঠিয়াছিল। তাহার পর বলিলেন—ছাপাখানায় 'এম্' কা'কে বলে তুই জানিস্? আমি বলিলাম—না। তিনি আমাকে 'এম্' বুঝাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন—কালীকৃষ্ণ মিত্র বঙ্কিমের একখানা ও আমারি একখানা বই আনিলেন। আমার বইয়ে যতগুলো 'এম্' ছিল বঙ্কিমের বইয়েরও ততগুলো 'এম্' লইলেন। তাহার পর কথা গণিতে লাগিলেন। আমার সেইটুকুতে ৫৫টা সংস্কৃত কথা ছিল, আর বঙ্কিমের ৬৫টা। আমি কালীকৃষ্ণবাবুকে দেখাইয়া দিলাম—এই ত, কার সংস্কৃত বেশী দেখ; তার ওপর আমি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, আর উনি অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দেখিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু

বিচলিত হইয়াছেন। কথাটা চাপা দিবার জন্য আমি বলিলাম—চলিত ভাষায় বই লেখা কি আপনার মত নয়? তিনি বলিলেন—ভাষাটা ত মার্জ্জিত হওয়া চাই। আমি বলিলাম—কিন্তু চলিত ভাষাতেও খুব ভাল ভাল বই হ'তে পারে এবং তা লোকে পড়েও খুব খুশী হয়। তখন আমি তাঁহাকে "বিবাহ-বিভ্রাট" নামক নাটকের ২য় গর্ভাঙ্কটি যতদূর মুখস্থ ছিল, আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাসি একটু বিচিত্র ছিল। তিনি হাসিতে হাসিতে নগিয়া পড়িতেন। এক এক সময় মনে হইত, তিনি বুঝি-বা চেয়ার হইতে পড়িয়া যান। তিনি অনেকবার নগিয়া নগিয়া পড়িলেন। যে-সকল জায়গায় হাসির কথা আছে সে-সব জায়গায় দেখিলাম তিনি খুব enjoy করিলেন। যথা—

"নন্দ। আহা, গৌরীবাবুর কি অদৃষ্ট!

বিলাসিনী। কি, jealousy হয় নাকি?

নন্দ। কার না হয়? আমি বিলেত থেকে ফেরা অবধি যদি আপনি মিস্ থাক্‌তেন?

বিলাসিনী। Wifeও widow হয়।

নন্দ। Would to God! সেকি হবে?

বিলাসিনী। আপনি সায়েন্স পড়েছেন, God বল্‌লেন যে? God মানেন না কি?

নন্দ। রাম! ওটা কথার কথা বললেম। যেদিন গ্যানো কিনেছি, সেইদিনই বুঝেছি—God নেই।"

ক্রমে আমার গর্ভাঙ্ক ফুরাইয়া আসিল। শেষ বেহারার প্রবেশ—

বেহারা। বহু মহারাজ!

বিলাসিনী। বাবু কেয়া করতা?

বেহারা। মসেলা পিস্‌তা।

গর্ভাঙ্ক শেষ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাসিও ফুরাইল। আমি তখন মনে করিলাম—বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি, তাঁহার সঙ্গে এ-রকম ফাজ্‌লামোটা ভাল হয় নাই। তিনিও তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়াই বলিলেন—এ বই কার লেখা? আমি বলিলাম গ্রন্থকার কে আমি জানি না। শুনিলাম তিনি বাগবাজারের থিয়েটারপার্টির একজন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেমন? আপনার এ বই ভাল লাগলো? তিনি বলিলেন—খুব। আমি বলিলাম—তবে আপনাকে একখানি বই আনাইয়া দিব। পরের দিন দোকানে দোকানে ঘুরিয়া একখানি বই সংগ্রহ করিলাম। বইখানি লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি গেলাম। দেখিলাম—টেবিলের উপরে রাশিকৃত বই কাগজ ছড়ানো রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—বই এনেছিস্ না-কি? আমি বইখানি তাঁহার সাম্‌নে রাখিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—বইখানা রেখে যা। তোর সঙ্গে আজ আর প'ড়ে উঠতে পাচ্ছি না। আজ ভারী ব্যস্ত।

কি করি! অত্যন্ত মনমরা হইয়া সেদিন ফিরিয়া আসিলাম।

শেষ অবস্থা

১৮৯১ সালের শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে আমি শুনিলাম—বিদ্যাসাগর মহাশয় হাওয়া-বদলির জন্য ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে একটি বাড়িতে আছেন। ফরাসডাঙ্গায় গবর্ন্মেণ্ট হাউসের দক্ষিণে কতকগুলি বাড়ি আছে, একেবারে গঙ্গার ওপরেই। অনেক কলিকাতার লোক সেখানে হাওয়া বদল করিতে যায়। এবার বিদ্যাসাগর মহাশয় উহারই একটি বাড়িতে ছিলেন। আমার তখন সাধ হইয়াছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এত কাছে আছেন, তখন একদিন তাঁহাকে বাড়িতে আনিয়া

তাঁহার পদধূলি লইব। তাই আমি একখানি নৌকা করিয়া ফরাসডাঙ্গার দিকে গেলাম; নৌকায় উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল যে আতপুরের মুখুজ্যেদের ইটখোলায় গিয়া একটা কথা বলিয়া আসি। তাই আগে আতপুরে গেলাম, পরে সেখান হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি গেলাম। তাঁহার বাড়ির সামনে গঙ্গার চড়ায় বিস্তর ইট পড়িয়াছিল, রাস্তা ছিল না, ইটের উপর দিয়া অতি কষ্টে যাইতে হইত। নৌকা হইতে নামিয়া দেখিলাম—সামনের বাড়িতে বারাণ্ডায় বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন,—আমার নৌকাখানা ও ইটের উপর দিয়া আমার যাওয়ার কষ্টটা দেখিতেছেন। আমি তাঁহার কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকিয়া এদিক-ওদিক বেড়াইতেছি, তিনি উপর হইতে বলিলেন—ঘরের ভেতর ঢোক্ না, উহার ভেতর সিঁড়ি আছে। আমি উপরে উঠিয়া দেখি বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়াই আছেন; টেবিলের কাছে চেয়ারে একটি লোক বসিয়া আছে। লোকটিকে কোথায় দেখিয়াছি দেখিয়াছি মনে হইল;—দুচারটি কথায় বুঝিতে পারিলাম তিনি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। বুঝিলাম—তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে চাকরি চান। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সহিত যেরূপভাবে কথা বলিতেছেন, তাহাতে বোধ হইল, তাঁহাকে স্নেহও করেন, সম্ভ্রমও করেন। তাঁহার সহিত বন্দোবস্তও হইল, তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজী পড়াইবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ২০০৲ শত টাকা মাহিনা দিবেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল, তিনি উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—তা হবে না, কিছু খেয়ে যেতে হবে। বলিয়াই পিছনের হলঘরে ঢুকিলেন। দেখিলাম সেখানে পাঁচ-সাতটি কাঁচের আলমারি আছে, প্রত্যেক তাকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আঁব। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে একখানি আসনে বসাইয়া সামনে একখানি রেকাবী দিয়া নিজে ছুরি দিয়া আঁব কাটিতে বসিলেন।

একবার এ-আঁবের এক চাক্‌লা দেন, একবার ও-আঁবের এক চাক্‌লা দেন,—পাঁচ-সাত রকমের আঁব তাঁহাকে খাওয়াইলেন। কর্ম্মাটাঁড়ে ভুট্টা দেখিয়াছিলাম, এখানে দেখিলাম আঁব।

আশুবাবু উঠিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কোথা এসেছিলি? আমি বলিলাম—আপনি এত কাছে আছেন, তাই মনে করিয়াছি, যদি আপনার পায়ের ধূলা আমার বাড়িতে পড়ে। বিদ্যাসাগর বলিলেন—কিন্তু তুই যে এদিক দিয়ে এলি? আমি ভাবিলাম—দুষ্টু বুড়া তাও দেখিয়াছে। বলিলাম—আপনার এখানে আসিব বলিয়াই বাহির হইয়াছিলাম, পথে একটা কথা মনে হওয়ায় মুখুজ্যেদের ইটখোলায় গিয়াছিলাম। তা আপনি যেতে পারবেন কি? গেলে আমরা কৃতার্থ হব। তিনি বলিলেন—কেন? তুই আমাকে ঘটা করিয়া খাওয়াইবি না কি? আমি বলিলাম—সে ভাগ্য কি আমার হবে? তিনি বলিলেন—তাই ত আমি বলিতেছিলাম; আমি কি খাই তা জানিস্? বেলশুঁঠোর সঙ্গে বার্লি সেদ্ধ ক'রে তাই একটু একটু খাই। তবে যে এই আঁব দেখছিস্, ও আমার জন্যে নয়। যে নিজে কিছু খেতে পারে না, অন্যকে খাইয়েই তার তৃপ্তি। তাই ত আশুকে অত ক'রে নিজে হাতে আঁব খাওয়াচ্ছিলাম। যা হোক, তুই এসেছিস্, ভালই হয়েছে। কিন্তু আমি তোকে জিজ্ঞাসা করবো না, তোর বাড়ির কে কেমন আছে, হয়ত তুই বলবি—অমুক মরিয়া গিয়েছে, অমুক ব্যামোয় ভুগছে, এসব কথা শুনতে আর আমার ইচ্ছে হয় না। আমার বড় কষ্ট হয়। আমি বলিলাম—ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের ওখানকার সব সংবাদই ভাল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বাড়িতে পায়ের ধুলোর কথা বলছিলি, তোরা কি নতুন বাড়ি করেছিস্ না কি? আমি বলিলাম—একটু কুঁড়ে বেঁধেছি বইকি। তিনি বলিলেন—আমি গেলে আমায় কি খাওয়াইতিস? আমি বলিলাম—বাড়ির মেয়েরা

স্বহস্তে পাক করিয়া কি খাওয়াইত, তা জানি না ; আমাদের দেশের দুটো ভাল জিনিষ আছে, আমি মনে করেছিলাম তাই খাওয়াব। তিনি বলিলেন—কি কি ? আমি বলিলাম—নৈহাটির গজা আর রসমুণ্ডি। তিনি বলিলেন—আচ্ছা, তা তবে আনিস্। আমি বলিলাম—আপনি যখন আনিস্ বললেন, তখন শুভস্য শীঘ্রং—আমি আসছে রবিবারেই লইয়া আসিব। তারপর আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আশুবাবু সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। একজন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ কেমন করিয়া বহিয়া যায়, আশুবাবু তাহার একজন নিদর্শন। উনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই লোকে উঁহার বিদ্যার সুখ্যাতি করে, কিন্তু স্বভাবের নিন্দা করে। আমি বলিলাম—যদি উনি নিবৃত্তিপ্রবৃত্তি করিয়া আপনার কলেজে থাকেন, আপনার কলেজেরও মঙ্গল, ওঁরও মঙ্গল। তিনি বলিলেন—তাই ত আমি ওকে নিলাম ও একেবারে ২০০৲ টাকা দিতে রাজী হলাম।

সেদিন সন্ধ্যা হয়-হয় দেখিয়া আমি আসিয়া নৌকায় উঠিলাম, এবং বাড়ি আসিয়াই রসমুণ্ডি ও গজার ফরমাস দিলাম। পরের রবিবারে ঐ দুটি জিনিষ লইয়া আমি আবার নৌকা করিয়া তাঁহার বাড়ি গেলাম। গিয়া দেখি তাঁহার ছোট জামাই শরৎ বাড়ির সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথা। সে বলিল—জরুরী কাজ পড়ায় কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। আমি হতাশ হইয়া পড়িলে শরৎ বলিল—আপনি কি তাঁর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলেন না-কি ? আমি বলিলাম—হাঁ এনেছি বইকি ? সে বলিল—তিনি ত আর খান না। আমরাই খাই, এটাও আমাদের দিয়ে যান। কারণ তিনি ত খাওয়াইয়াই খুশী। আমি বলিলাম—ভাল, তাই-সই। নৌকায় আছে, নাও। শরৎ হাঁড়ি দুটি লইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল, আমিও ফিরিয়া আসিয়া নৌকায় বসিলাম। মনটা বড় খারাপ হইল। সোমবারে

কলিকাতায় আসিলাম। বৃহস্পতিবারে সকালে শুনিলাম—বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বহুতর লোক খালি-পায়ে তাঁহার বাড়িতে যাইতেছে। আমিও তাহাই করিলাম। দেখিলাম—তাঁহার বাড়িতে অনেক লোক। সকলেই উৎসুক হইয়া শুনিতেছে—কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল, কেমন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল, কোথায় কোথায় তাঁহার খাট নামানো হইল। আমিও একমনে তাহাই শুনিতে লাগিলাম। সেখানে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনিই আমাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসেন, প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবুর কাছে আমাকে চিনাইয়া দিয়া আসেন এবং দশ-পনর দিন সকালে আমার পড়া বলিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করেন। তিনি দাদার মৃত্যুতে বড়ই কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলাম, কিন্তু তাঁহার কান্না থামিল না।'

নিবেদন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনেকগুলি জীবনচরিত আছে। তাহার মধ্যে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১ম সং. সেপ্টেম্বর ১৮৯১), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম সং. মে ১৮৯৫) এবং বিহারীলাল সরকার (১ম সং. সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) রচিত জীবনচরিত তিনখানি অপেক্ষাকৃত বড় ও বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। আবার, এই তিনখানি গ্রন্থের সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা—অনেক নূতন তথ্য সমেত—সুবলচন্দ্র মিত্র প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের ইংরেজী জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০৭) স্থান পাইয়াছে। এ অবস্থায় অনেকে হয়ত বলিতে পারেন, এতগুলি জীবনচরিত থাকিতে আবার নূতন করিয়া 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' প্রকাশের সার্থকতা কি? এ সম্বন্ধে আমার একটু কৈফিয়ৎ আছে। এই-সকল জীবনচরিতে সমাজ-সংস্কার, লোকসেবা প্রভৃতি কার্য্যে বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তির কথা যেরূপ পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছে, স্বদেশে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তির কথা সেরূপভাবে আলোচিত হয় নাই। প্রধানতঃ এই অভাব পূরণার্থই বর্ত্তমান পুস্তক রচিত হইয়াছে। জীবনচরিত-রচনার নানা পদ্ধতি আছে। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়াও জীবনী লেখা যায়। আমি সেই চেষ্টা করিয়াছি। বাংলা ও ভারত গভর্ন্মেণ্টের দপ্তরখানায় অনুসন্ধানের ফলে, শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারী এবং বে-সরকারী পরামর্শদাতা রূপে বিদ্যাসাগরের সহিত সরকারের যে পত্র-ব্যবহার * হইয়াছিল,

* এই সকল পত্র ইংরেজীতে লিখিত। এগুলি আমি প্রথমে মডার্ণ রিভিউ পত্রে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২৭, মে-জুন ১৯২৮, মে ১৯২৯, সেপ্টেম্বর ১৯৩০) ও ১৯২৭ সালের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে (N. S. XXIII) প্রকাশ করি।

সেগুলি আমার হস্তগত হয়। প্রধানতঃ এই সকল অপ্রকাশিত চিঠিপত্রের সাহায্যেই 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনচরিতকারগণ কেহই এই অমূল্য উপাদানের সন্ধান পান নাই।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি. আই. ই. মহোদয় একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা পুস্তক-রচনায় আমাকে অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের উভয়কেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩, বীটন রো,

কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩৩৮

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ

সংস্কৃত-শিক্ষার সংস্কার

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা-বিপর্য্যয়ের ফলে বাংলার পুরাতন ধারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের যুগ, আর উনবিংশ শতাব্দী চিন্তারাজ্যের বিবর্ত্তনের যুগ। এই শেষোক্ত যুগকে 'রেনেসাঁস্' বা 'ভারতের নবজীবন' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজ যখন ভারতবর্ষে দখল আরম্ভ করে, তখন দেশীয় রাজ্যগুলির শুধু যে ভগ্নাবস্থা ছিল তাহা নহে,—সমাজ এবং ভারতীয় মধ্যযুগের সভ্যতাও তখন জীর্ণ, মৃত। পুরাতন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নূতন তখনও গড়িয়া উঠে নাই। এইরূপ অবস্থায় কিছুদিন কাটিয়া গেল। পলাশীর যুদ্ধের ৭৫ বৎসর পরে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে নবযুগের আরম্ভ।

রাজা রামমোহন রায় এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। তিনি যে বিপ্লবের স্থচনা করেন, তাহা চিন্তারাজ্যের বিপ্লব। সে আন্দোলন ক্রমে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া এদেশে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের ফল—নূতন সাহিত্য, মনের নূতন বিশ্বাস, সমাজের নূতন গঠন, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন জীবন,—এক কথায় ভারতবর্ষের আধুনিক সভ্যতা।

এই পরিবর্ত্তন দুই ধারায় বহিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা ইহার এক ধারা ; অপর ধারা—ভারতের সেই বিস্মৃত বিশুদ্ধ প্রাচীন সাহিত্য, জ্ঞান ও চিন্তার পুনরুদ্ধার। এই উভয় ক্ষেত্রেই

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নেতা। একদিকে তিনি প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রে সূক্ষ্মবিচারশীল পণ্ডিত; অপর দিকে তিনি বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় কর্ম্মীর দ্বারা পরিচালিত উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের স্রষ্টা। একদিকে তিনি যেমন মানবহিতৈষী সহৃদয় সমাজ-সংস্কারক, অন্যদিকে তেমনি অগ্রগণ্য শিক্ষারথী,—ঐ দ্বি-ধারায় প্রবাহিত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির অগ্রদূত। সরকারী দপ্তরখানায় আবিষ্কৃত অপ্রকাশিত চিঠিপত্রের সাহায্যে, শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় কার্য্যাবলীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায় শুধু আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে না, জ্ঞানবৃদ্ধিরও সহায়তা করিবে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০)। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বংশগত প্রথামত তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রথমে সংস্কৃত-সাহিত্য শিখাইতে মনস্থ করেন। নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতার গভর্ন্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় (১ জুন, ১৮২৯)। প্রায় সাড়ে বার বৎসর কলেজে অধ্যয়নের ফলে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, গণিত, ন্যায়, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তাঁহার সমগ্র ছাত্রজীবন অপূর্ব্ব কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। একুশ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি কলেজ হইতে বাহির হইলেন। অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা-স্বরূপ অধ্যাপকবর্গ তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে বিভূষিত করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৪১)।

সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষা-বিভাগেই বিদ্যাসাগরের চাকরি জুটিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা-বিভাগের

সেরেস্তাদারের পদ খালি হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হইলেন। সংস্কৃত কলেজের কার্য্যের সহিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি —কাপ্তেন মার্শালের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের সহিত তিনি পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। মার্শাল ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বঙ্গীয় গভর্ন্মেণ্টের নিকট এক সুপারিশ-পত্র পাঠাইলেন। সেই পত্র হইতে জানা যায়, বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনি স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞান অল্প ছিল না। ইংরেজী তখন তিনি সামান্যই জানিতেন। সেই বৎসরের ২৯এ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে সেরেস্তাদারের পদে বাহাল হইলেন। বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরুর ইহাই কর্ম্মজীবনের আরম্ভ।

কাপ্তেন মার্শাল সেরেস্তাদারের কাজে খুশী হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতের সংশ্রবে আসিয়া তিনি ক্রমেই তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, জ্ঞানের গভীরতা, কর্ম্মের ক্ষমতা এবং স্থৈর্য্য, তেজস্বিতা ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকিবার কালে অনেক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ ও গণ্যমান্য দেশীয় বড়লোকের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ-পরিচয় হয়। কাপ্তেন মার্শাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বা শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটের সহিত বিদ্যাসাগরকে পরিচিত করাইয়া দেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকরি বিদ্যাসাগরের জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিল। এই চাকরি-গ্রহণের ফলে তাঁহাকে ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিতে হইল; শেষে এই চটি-পরা পণ্ডিতের ইংরেজীর দখল দেখিয়া নব্য শিক্ষিতেরাও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।

১৮৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোকগমনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। ডাঃ ময়েট

এই পদে একজন সুযোগ্য লোক নির্ব্বাচনের জন্য কাপ্তেন মার্শালের সহিত পরামর্শ করিতে যান। মার্শাল দেখিলেন, ইংরেজীও জানে, সংস্কৃতেও অভিজ্ঞ এমন পণ্ডিত আছে এক বিদ্যাসাগর। তিনি ময়েটের কাছে বিদ্যাসাগরের কথাই বলিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫০৲ টাকা মাহিনায় সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। (এপ্রিল, ১৮৪৬)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিদ্যাসাগরের স্থানে লওয়া হইল—তাঁহার ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে। দীনবন্ধুও সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র।

ঠিক এই সময় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যুতে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ খালি হইল। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরকেই ঐ শূন্যপদে বসাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই পদ গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগরের মাসিক আয় আরও ৪০৲ টাকা বাড়িত। কিন্তু এ কাজ তিনি তাঁহার সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকেই ছাড়িয়া দিলেন। তর্কালঙ্কার তখন ৫০৲ টাকা বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজের হেড-পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজে নূতন নীতি চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এক উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন। কলেজের সম্পাদক বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের প্রধান প্রস্তাবগুলি শিক্ষা-পরিষদে পেশ করিলেন। সেগুলি গৃহীতও হইল। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যবিষয় ও রুটিন্ প্রভৃতি অনেকটা বদলাইয়া গেল।

এ কার্য্য কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে বেশী দিন করিতে হইল না। সম্পাদক রসময় দত্ত সংস্কারের বহর দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বিদ্যাসাগরের কতকগুলি প্রস্তাব তিনি একেবারে নাকচ করিলেন। সেই বাধায় বিদ্যাসাগরের জলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত চটিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিলেন (এপ্রিল, ১৮৪৭)। বন্ধুদের সহস্র

অনুরোধ তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ইহা এক বিশেষত্ব।

মার্শাল ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড্-রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের কাজ খালি হওয়ায় তিনি তখনই সেই পদে বিদ্যাসাগরকে বাহাল করিলেন। এই পদ শূন্য হওয়ার ইতিহাসটুকু চিত্তাকর্ষক। দেশ-বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথের পিতা, তালতলার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ করিয়াও অতিরিক্ত ছাত্র হিসাবে মেডিক্যাল কলেজে লেকচার শুনিতে যাইতেন। অবশেষে তিনি ডাক্তারি করাই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন। ১৮৪৯, ১৬ই জানুয়ারি মেজর মার্শালের হাতে দুর্গাচরণ পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলে, তাঁহার স্থানে পাঁচ হাজার টাকার জামিনে মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর নিযুক্ত হইলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটারি ডাঃ ময়েট তাঁহার স্থানে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ তাঁহাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন।

১৮৫০, ৪ঠা ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছাড়িয়া বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের

উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর 'দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা-প্রসূত' এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন।* কলেজ-পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও পাঠ্য-প্রণালীর বহুবিধ পরিবর্ত্তন সমর্থন করিয়া এই রিপোর্ট লিখিত। পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হইবে, এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষক-রূপে একদিন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে,—পরিবর্ত্তনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ,—রিপোর্টে তিনি এ কথা দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন।

শিক্ষা-পরিষদ এমনই একজন কার্য্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাহিতে-ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই কথাই কিছুদিন হইতে তাঁহারা ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে পুরাতনের বাধা সরিয়া গেল। শিক্ষা-পরিষদ বঙ্গীয় গভর্ন্মেণ্টকে লিখিলেন—

"দশ বছর ধরিয়া বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। তাহার উপর সারাদিন তিনি অন্যত্র দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের যখন কাজ চলে, তখন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ফলে কলেজের শৃঙ্খলা শিথিল হইয়াছে। হাজিরা খাতার উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, এবং নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—কার্য্যকারিতা একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অথচ এই বিদ্যালয় এক

* এই দীর্ঘ রিপোর্ট *General Report on Public Instruction*, etc. 1850-51 গ্রন্থের ৩৭-৪৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, কারণ কলেজের ছেলেদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হয় না।

'বাংলায় সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, কর্ম্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সংস্কৃত কলেজ সেই আন্দোলনের সহায়করূপে অনেক কাজ করিতে পারে।

'বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একমাত্র অন্তরায় দূর হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডাঃ স্প্রেঙ্গার আর্ব্বী ভাষায় যেরূপ সুপণ্ডিত, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাওয়া যাইতেছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষা-পরিষদের মতে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। একদিকে তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংস্কৃত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মত উদ্যমশীল, কর্ম্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালীর মধ্যে দুর্ল্লভ। তাঁহার রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'চেম্বার্সের বায়োগ্রাফি'র বঙ্গানুবাদ সমস্ত গভর্ন্মেণ্ট স্কুল-কলেজেই বাংলার পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইলে বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠিয়া যাইবে। এই দুই পদের বেতন মোট ১৫০৲ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০৲ টাকা দিলেই চলিবে। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনে ব্যয়বৃদ্ধির কোনো আশঙ্কা নাই।

'গভর্ন্মেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল।"

(৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৫১)*

* *Education Consultation, 29 Jany. 1851*, No. 3.

সরকার শিক্ষা-পরিষদের প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যাসাগর মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন (২২এ জানুয়ারি, ১৮৫১)। এক কথায়, কলেজের সংস্কার, পুনর্গঠন ও পরিবর্ত্তনের পূর্ণ অধিকার তাঁহার হাতে দেওয়া হইল।

১৮৫১ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইহার পুনর্গঠনের ইতিহাস। বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলার দিকে বিদ্যাসাগর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। নিয়মিত উপস্থিতির দিকে নজর রাখা হইল; সামান্য কারণে শ্রেণীত্যাগ এবং অকারণ গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি নিবারণ করার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইল। প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়া সপ্তাহান্তে রবিবারে ছুটির দিন ধার্য্য হইল। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকারী ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন—দেশে শিক্ষাবিস্তার ও লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির পরম পক্ষ। তিনি ১৮৫১, জুলাই মাসে প্রথমে কায়স্থ, পরে ১৮৫৪, ডিসেম্বর মাসে যে-কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুকে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অবাধ অনুমতি দিলেন।

বিদ্যাসাগর নিজের কলেজের জন্য আর একটি কাজ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্মান ও ছাত্রদের ভবিষ্যতের উপরও যে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুকলেজ ও মাদ্রাসার পাশ-করা কৃতবিদ্য ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া হইত। বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদের মধ্য দিয়া গভর্ন্মেণ্টের কাছে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য ছাত্রদিগকে এই বিষয়ে সমান সুযোগ ও সুবিধা দিবার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলেন (১৩ই জানুয়ারি, ১৮৫২)। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে পরে ডেপুটিগিরি দেওয়া হইত।*

* *Education Con. 15 April 1852*, No. 3, see also Nos. 2 & 4.

১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠা হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। ফলে দাঁড়াইয়াছিল এই, ছাত্রেরা বিনা প্রতিবন্ধে কলেজে প্রবেশলাভ করিতে পারিত এবং পরে সুবিধা পাইলেই অন্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইত। এমনও হইত, ভর্ত্তি হইয়া নাম লিখাইয়া ছেলের আর দেখা নাই, তারপর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে যখন হাজিরা খাতা হইতে নাম কাটা গেল, তখন ছাত্র অথবা ছাত্রের অভিভাবক এমন করিয়া আসিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে ধরিয়া পড়িল যে, নিবেদন অগ্রাহ্য করা দুরূহ। এই-সব অসুবিধা দুর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫২ সালের আগষ্ট মাসে প্রথমে দুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। পুনঃপ্রবেশের জন্যও ঐ ব্যবস্থা বাহাল হইল। তারপর ১৮৫৪, জুন মাসের মাঝামাঝি মাসিক এক টাকা বেতনের বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে অব্যবস্থিতচিত্ত ছাত্রদের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইল, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির হারও যথেষ্ট বাড়িয়া গেল।

১৮৫১ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে এক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। ব্যাকরণ-বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইল। পূর্ব্বে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ' ছিল ব্যাকরণের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক। সংস্কৃত শিক্ষার গোড়াতেই সংস্কৃতে লেখা এই দুরূহ ব্যাকরণখানি ছেলেদের পড়িতে হইত। এখানি আয়ত্ত করিতে লাগিত—চার-পাঁচ বৎসর; তাও ছেলেরা অর্থ না বুঝিয়াই মুখস্থ করিত। কাজেই সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িবার সময় এই মুখস্থ বিদ্যা বিশেষ কাজে লাগিত না; দেখা যাইত, ভাষায় তাহারা আশানুরূপ অধিকার লাভ করে নাই। বিদ্যাসাগর ছেলেদের বাধাটুকু বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, বাঙালী ছাত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে হইলে বাংলায় ব্যাকরণ পড়াইতে হইবে। তিনি 'মুগ্ধবোধ' পড়ানো বন্ধ করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাংলায় লেখা স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও

'ব্যাকরণ কৌমুদী' ধরাইলেন। এই সঙ্গে 'ঋজুপাঠ'ও পড়ানো হইতে লাগিল। সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত অংশ ঋজুপাঠে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নব ব্যবস্থার ফল ভালই হইল। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় সংস্কৃতে মোটামুটিরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে তিন বৎসরের বেশী সময় লাগে না।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার বাধাবিপত্তি এমনি করিয়া দূর করিলেন। কিন্তু তাঁহার সামনে এখনও সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগ পুনর্গঠিত করিবার কাজ পড়িয়া রহিল।

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন

দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; প্রথম, হিন্দু সাহিত্যের অনুশীলন ; দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রম-প্রচলন। বাংলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য ১৮২৭, মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী ক্লাস খোলা হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪২, অক্টোবর মাসে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় এই বিভাগ পুনস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগর এই ইংরেজী-বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীর ভিতরের গলদ বেশ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি ইহাকে ফলপ্রসূ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

বাংলায় ভাল শিক্ষক হইতে হইলে এবং নব সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের পক্ষে সংস্কৃত ও ইংরেজী, এই দুই ভাষাতেই যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়া দরকার—ইহাই বিদ্যাসাগরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই অভিপ্রায়ে তিনি ১৮৫৩, ১৬ই জুলাই শিক্ষা-পরিষদকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন।* ইংরেজী-বিভাগ সুদৃঢ় ও পুনর্গঠিত করা যে নিতান্ত আবশ্যক, আর তাহা করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, এবং বিলাতের ডিরেক্টরদের ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১নং পত্র অনুসারে সে অর্থ যে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের অনুষ্ঠানগুলি এখনও পাইতে পারে, পত্রে তিনি সে দাবি করিতে ছাড়িলেন না। সংস্কৃত শিখিবার জন্য ক্রমাগত ছেলে আসিতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে কলেজে স্থান দিতে হইলে অবিলম্বে একটি

---

* *Education Con. 22 Sept. 1853*, No. 44.

অতিরিক্ত সংস্কৃত ক্লাস খোলা দরকার। ইহার জন্য অন্ততঃ ত্রিশ টাকা বেতনের একজন সুদক্ষ শিক্ষক রাখিতে হইবে। ইংরেজী-বিভাগ ভাল করিয়া চালাইতে হইলে পাঁচজন শিক্ষকের প্রয়োজন। এই পাঁচজনের বেতন মাসে ৩৬০ টাকা লাগিবে। তন্মধ্যে এখন তিনজন শিক্ষক ও সংস্কৃত-গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপককে মাসিক ২৮২ টাকা দিতে হয়। অতএব যে টাকাটা প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্রসমূহের জন্য খরচ করিবার কথা, সেই টাকা হইতে আর ৭৮ টাকা দিলেই এখন চলিতে পারে। অবশ্য সংস্কৃত-বিভাগের একজন নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকের জন্য আর ৩০ টাকা লাগিবে। তাহা হইলে মাসিক মোট ১০৮, অর্থাৎ বার্ষিক ১২৯৬ টাকা, অধিক খরচা হইবে। ডিরেক্টরদের পত্রের অঙ্গীকার ধরিয়া এবং অঙ্কের হিসাব করিয়া এই সুদীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করিলেন, বার্ষিক ২৪,০০০ টাকা পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে। সরকার সংস্কৃত কলেজের ১৮৪০ সালের খরচা বাবদ ১৭,৬৯৪ টাকা মঞ্জুর করেন। সেই অবধি বোধ হয় এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, সংস্কৃত কলেজ উহার অতিরিক্ত আর একটি পয়সাও সরকারের নিকট দাবি করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র ঐটুকুই দেয় নয়। কাজেই বর্ত্তমানে বার্ষিক আরও ১২৯৬ টাকা দিলেও সরকারের বাস্তবিক অধিক ব্যয় হইবে না।

ইংরেজী ও সংস্কৃত—উভয় ভাষার এইরূপ মিলিত শিক্ষার উপকার উপলব্ধি করিয়া শিক্ষা-পরিষদ সরকারের সম্মতিক্রমে এই অধিক অর্থব্যয় মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যাসাগরের যুক্তিপূর্ণ প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ১৮৫৩, নভেম্বর মাসে ইংরেজী-বিভাগে একটি অধিকতর বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বিত হইল। পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক একশত টাকা বেতনে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী হইলেন ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস হইলেন গণিতের অধ্যাপক। পূর্ব্বে সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্রের

অধ্যাপনা চলিত—ভাস্করাচার্য্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। বিদ্যাসাগর ইহা উঠাইয়া দিয়া অতঃপর ইংরেজীতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে ইংরেজী অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের অন্তর্গত করা হইল।

বিদ্যাসাগর যখন এই-সব সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় শিক্ষা-পরিষদ কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. আর. ব্যালাণ্টাইনকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিবার জন্য আহ্বান করিতে চাহিলেন। পরিষদ এই সম্পর্কে সরকারকে লিখিলেন :—

"বর্ত্তমান সুযোগ্য উদ্যোগী অধ্যক্ষের নিয়োগ অবধি সংস্কৃত কলেজে বহুবিধ গুরুতর সংস্কারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে,—সরকার ইহা অবগত আছেন। ফল ইহাতে ভালই হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখনকার তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টির এক অতিপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বর্ত্তমানে যে-সব পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য যাহা সঙ্কল্পিত আছে, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত-পণ্ডিতের মত জানিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদ বিশেষ ইচ্ছুক।" (২১ মে, ১৮৫৩) *

শিক্ষা-পরিষদের নিমন্ত্রণে ডাঃ ব্যালাণ্টাইন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন (জুলাই-আগষ্ট)। পরিদর্শনান্তে একটি রিপোর্ট পরিষদে পেশ করিলেন :—

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনিয়া এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কে তৎপ্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, এই সুধী অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে আমার সে ধারণা দৃঢ়তর হইল,—এই আলাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম।"

* *General Dept. Con. 16 June 1853*, No 43.

কলেজের পঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিবার পর তিনি কাশী ও কলিকাতা—এই উভয় সংস্কৃত কলেজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বারাণসীতে আবশ্যিক ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা যে সম্প্রতি অসমীচীন, এই মত প্রকাশ করেন।

তারপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নূতন কতকগুলি পুস্তক প্রবর্ত্তন ও ছাত্রদের ভাবগ্রহণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন, তাহা বিদ্যাসাগরের পরবর্ত্তী রিপোর্ট হইতে জানা যাইবে। নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ ব্যালাণ্টাইন তাঁহার রিপোর্ট শেষ করিয়াছেন :—

"ভারতীয় পাণ্ডিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা ঘুচাইবার জন্যই আমি এই-সকল কথার অবতারণা করিয়াছি।··· কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয়বিধ পাঠ্যই পড়িতে হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রে কোথায় মিল, কোথায় অমিল—তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ যে সন্তোষজনক নয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং সেইজন্যই কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া অতিরিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছি···।"

শিক্ষা-পরিষদ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (২৯ আগষ্ট, ১৮৫৩)। বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের বর্ণিত প্রণালীর সমর্থন করিতে না পারিয়া পরিষদের নিকট নিম্নলিখিত উত্তর প্রেরণ করিলেন :—

"বিদ্যালয়ে যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের মত গুণী লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে সংক্ষিপ্ত-সার তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য-পুস্তকরূপে তাহাই তিনি প্রবর্ত্তিত করিতে চান। বর্ত্তমান অবস্থায়, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে মিলের গ্রন্থ পড়ানো একান্ত প্রয়োজন। মিলের পুস্তকের মূল্য অধিক ;—ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সারের প্রচলন প্রস্তাবের প্রধান কারণ ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ একটু বেশী দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন বলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত-সার মিলের লজিকের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু মিল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষভাবে লিখিয়া দিয়াছেন যে, আর্চবিশপ হোয়েটলির তর্কশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থই তাঁহার লজিকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা। অতএব এ-বিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা-পরিষদের উপর রহিল। ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূর্ব্ব হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়ানো যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সম্বন্ধীয় 'তর্ক-সংগ্রহ' এবং সাংখ্য-সম্পর্কিত 'তত্ত্বসমাস' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্যসূচিতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের নির্দ্দেশ আছে। বিশপ্ বার্কলের *Inquiry* সম্বন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্যপুস্তকরূপে ইহার প্রবর্ত্তনে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত-শাস্ত্র পড়াইয়া উপায় নাই। সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে

নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিষ। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার। বার্কলের *Inquiry* বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে; ইউরোপেও এখন আর ইহা খাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোনক্রমেই সে কাজ চলিবে না। তা ছাড়া হিন্দু-শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলন করিতে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত নহি।

"সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধতিই যে ভাল, একথা ডাঃ ব্যালাণ্টাইন স্বীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠের ফলে 'সত্য দ্বিবিধ'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে, এ ভয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—'এ ভয় অলীক নয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজীতেও অভিজ্ঞ আমি এমন-সব ব্রাহ্মণকে জানি যাঁহারা পাশ্চাত্য লজিক ও সংস্কৃত ন্যায়,—এই উভয় শাস্ত্রের মত ঠিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু উভয়ের মূল তত্ত্বের ঐক্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা তাঁহাদের নাই এবং সেজন্য এক ভাষায় অন্যটির চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশ করিতে অক্ষম।' আমার বিশ্বাস যে-লোক সংস্কৃত ও ইংরেজী—এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে—বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ভয় করিবার কোনো কারণ নাই। যে যথার্থরূপে ধারণা করিয়াছে, তাহার

কাছে সত্য—সত্যই। 'সত্য দুই রকমের' এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই ঐক্য যদি কোনো বুদ্ধিমান ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনা সত্যই অদ্ভুত বলিতে হইবে। ধরা যাক্, ইংরেজী ও সংস্কৃত—উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের যে-কোনো বিভাগ অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে, 'লজিকের পাশ্চাত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য,' অথচ যদি তাহারা উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, না হয়, যে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; তাহার কারণ সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইন আরও বলেন,—'বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের গঠন-পদ্ধতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় শিক্ষার রীতি হইতেই বুঝা যায়, এমন একদল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার কার্য্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে দৃশ্যত অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করিবে;—হিন্দুর দার্শনিক আলোচনা যে-সকল প্রাথমিক সত্যে পৌঁছিয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য

বিধান করিবে।' দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যাল্যান্টাইনের সহিত অন্যমত। আমার মনে হয় না আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি-বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয় উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য-সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোনো নূতন তত্ত্ব, এমন কি তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবর্দ্ধিত স্বরূপ—যদি তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আরব-সেনাপতি অমরু আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দিলেন, 'গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অনুযায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ; যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট; আর যদি বিরুদ্ধ-মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।' আমার বলিতে লজ্জা হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামি ঐ আরব-খালিফের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্র-সমূহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নূতন সত্যের কথা অবতারণা করিলে, তাহারা হাসি-ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশপাশে—পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; শাস্ত্রে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখানো দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং

'আমাদেরই জয়' এই ভাব ফুটিয়া উঠে। এই-সব বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোনো আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না। যে-প্রদেশের পণ্ডিতদের দেখিয়া ডাঃ ব্যালাণ্টাইন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মত খাটাইলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

"বাংলার কথা স্বতন্ত্র। 'দুইস্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত' এবং 'জোর করিয়া সামঞ্জস্য-বিধান বিজ্ঞের কার্য্য নহে'— তাঁহার এই মন্তব্যগুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের এই অংশের স্থানীয় অবস্থার দরুণ শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি সযত্নে এখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোনকিছুতে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই, কেন-না আমরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই না। আজ ইঁহাদের সম্মানও লুপ্তপ্রায়, কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখি না। ইঁহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এ-দলের পূর্ব্ব-আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাংলা দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই-সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি

পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে ; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই ধরণের লোক হইয়া উঠিবে—এমন আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে—ইহাতে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইংরেজী-বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও যে তাহারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে—তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুখের বিষয়, সম্প্রতি তাহাদের চিন্তাধারায় এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে। এখানকার সংস্কৃত কলেজের কাছে কি আশা করা যাইতে পারে, তাহার নমুনাস্বরূপ রিপোর্টের সঙ্গে গতবর্ষের একটি বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইলাম। প্রবন্ধটির লেখক—দর্শন-বিভাগের ছাত্র রামকমল শর্ম্মা। রামকমল এই বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, কলেজের পাঠ শেষ করিতে তাহার এখনও তিন বৎসর বাকী, এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সে এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।”

এই পত্র-বিনিময় হইতে হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। সংস্কৃত-শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, অথচ আনুষঙ্গিক শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি মোটেই ছিল না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং অসাধারণ কর্ম্মী। পাশ্চাত্য জ্ঞান-আহরণের পক্ষে প্রাচীন শাস্ত্রের উপর অন্ধভক্তিই যে প্রধান অন্তরায়,—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। ভারতবাসীর মন পাশ্চাত্য-জ্ঞানমণ্ডিত হইয়া উঠে,—ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক অভিলাষ। সেইজন্য সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের উন্নতির তিনি এত পক্ষপাতী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, কার্য্যকরী শিক্ষার প্রতি বেশী ঝোঁক থাকায় বিদ্যাসাগর ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পান নাই। শিক্ষা-পরিষদে প্রেরিত পত্রে তাই তিনি বলিয়াছেন,—"কতকগুলি কারণে—যাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন—সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য না পড়াইয়া উপায় নাই। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।" গোড়ায় যখন এদেশে ইংরেজী-শিক্ষার প্রচলন সুরু হয়, তখন একদল গোঁড়া পণ্ডিত ইহার অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য,—যাহা কিছু দরকারী, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদের বাক্যের মধ্যেই তাহা পাওয়া যায়, ইংরেজী-শিক্ষা যে শুধু অপ্রয়োজনীয় তাহা নহে—সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলার বিরোধী। ইহার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই সুরু হইল। সংস্কার-প্রয়াসী একদল হিন্দু একেবারে বিপরীত পথে চলিলেন; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হিন্দুশাস্ত্রে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও বিদ্যাসাগরের ঝোঁক ছিল এই নূতন দলের দিকে। সুবিধার জন্য হিন্দু-দর্শনের দোহাই দিলেও ইহাতে তাঁহার নিজের বিশ্বাস মোটেই ছিল না। রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের উভয় দিকই ভাল বুঝিতেন; বিদ্যাসাগরের মধ্যে রামমোহনের সেই উদার-দৃষ্টির অভাব

ছিল। নব্য ইউরোপীয়ের মত বিদ্যাসাগরের দৃষ্টির পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ। ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয়তা, অপ্রয়োজনীয়তা দিয়া তিনি সকল কাজের মূল্য বিচার করিতেন এবং সকল কর্ম্মানুষ্ঠানেই 'জন্ বুল'-এর জিদ ও অদম্য উৎসাহ দেখাইতেন।

শিক্ষা-পরিষদ সব দিক বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন :—

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উন্নতির সম্বন্ধে এমন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া শিক্ষা-পরিষদ আনন্দিত।…পরিষদ চান যে, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সার ও অন্যান্য গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। তাঁহার নিজের ও তাঁহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত বিষয়-সমূহের অর্থ বুঝাইবার ও উদাহরণ দিবার জন্য এগুলি অত্যন্ত কাজে লাগিবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ে এই-সব বিষয়ের শিক্ষার্থিগণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে। তাঁহার বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার করেন। কাশী ও কলিকাতা—এই দুইটি প্রধান বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে অবাধে মতের বিনিময় করেন—ইহাই শিক্ষা-পরিষদের ইচ্ছা।" (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩)

সংস্কৃত কলেজ নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি নিজ কার্য্যে অন্যের হস্তক্ষেপ সহিতে পারিতেন না এবং যাহা ঠিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইতে এক চুলও নড়িতেন না। ১৮৫৩, ৫ই অক্টোবর শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে লিখিত এই আধা-সরকারী চিঠিখানি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম ; সেই আদেশগুলি হুবহু প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে। ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়াও ক্ষতিকর হইবে।

"কলেজ বন্ধ এবং বাড়ি যাইবার উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার দরুণ আমি এ-বিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি আমার মনে আসিয়াছে ; কলিকাতা-ত্যাগের পূর্ব্বে তাহা আমি জানাইয়া যাইতে চাই।

"যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমি অনুমোদন করিতে পারি না তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা আমার [illegible]পদস্থ একজন অধ্যক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্য্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি না ; এই-সব সর্ত্তে কাজ করিতে কোনো শিক্ষিত ইংরেজই রাজী হইত না। ব্যক্তিগত আপত্তি ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ে অবতীর্ণ হইতেছি।

"মনে হয়, ডাঃ ব্যালাণ্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য না হইলে ইংরেজী সংস্কৃতের ছাত্রেরা 'দুইরূপ সত্যের' অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। তাঁহার কাশীর পণ্ডিত-বন্ধুগণের মনোবৃত্তির সম্বন্ধে আমি কোনো প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু একথা আমি জানি এবং জোর করিয়া বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন একজনও বুদ্ধিমান লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীতে শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, 'সত্য দুই প্রকার।'

"বাংলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে পাই, তারপর যদি ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্য্যে শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন একদল যুবক তৈয়ারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরেজী অথবা দেশীয় যে-কোনো কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে। আমার এই একান্ত অভিলাষ—এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যকর করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন-কৃত সংক্ষিপ্ত-সার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি অনুমোদন করিতে পারি—যেমন *Novum Organum*-এর সুন্দর ইংরেজী সংস্করণ—তাহা আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্যালয়ে চালাইব। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য, অথবা আমি যেখানকার অধ্যক্ষ সেই বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়াই যদি আমাকে তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—'আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।' এইরূপ ব্যবস্থা আমার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে এবং শিক্ষা-পরিষদের কর্ম্মচারী হিসাবে আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান সত্ত্বেও যে-দায়িত্ব আমি তীক্ষ্ণভাবে বোধ করি, তাহা একেবারে নষ্ট না হোক—ক্ষীণ হইয়া আসিবে।

"আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগুলি শিক্ষা-পরিষদ সদয়ভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাব কতকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন,—যাহাতে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্দেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না হইয়া পড়ে।

"যদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এই বিষয়ে সরকারী—
স্থতরাং অধিকতর কেতাদুরস্ত—পত্র লিখিব।"*

এই পত্রখানিতে স্থফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী যে স্থফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। এই সাফল্যের একটি প্রধান কারণ,—নিজের তাঁবে ঠিক ধরণের লোক বাছিয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের ছিল। সংস্কারের ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৫৪, জানুয়ারি মাস হইতে বিদ্যাসাগরের বেতন বাড়াইয়া তিন শত টাকা করিয়া দেন।

রাজকর্ম্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে সম্মান করিয়া চলিতেন। শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্যে তাঁহারা পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সিভিলিয়ানদিগকে প্রাচ্যভাষা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভাঙিয়া ১৮৫৪ জানুয়ারি মাসে বোর্ড অফ একজামিনার্স গঠিত হইলে বিদ্যাসাগরকে বোর্ডের একজন কর্ম্মী-সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ও বাংলার প্রথম ছোটলাট ফ্রেডারিক্ হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে পরিষদ বারাসতের নিকটবর্ত্তী বামুনমুড়া বঙ্গবিদ্যালয় প্রদর্শন করিতে বিদ্যাসাগরকে পাঠাইয়াছিলেন (জুলাই, ১৮৫৪)। †

শুধু পণ্ডিত নয়, বিদ্যাসাগর সাহিত্য-রসিক ছিলেন। বাংলার বহু সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কোনো-না-কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

* ডাঃ ব্যালান্টাইনের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কীয় রিপোর্ট ও বিদ্যাসাগরের পত্র দুইখানি বঙ্গীয় গভর্ন্মেন্টের দপ্তরখানা হইতে গৃহীত।

† বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট:—*Education Con. 14 Sept., 1854,* No. 152 দ্রষ্টব্য।

কলিকাতার ভার্ণাকিউলার লিটরেচার সোসাইটি নানাবিধ উত্তম পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ করিতেন। এই সভার উপর বিদ্যাসাগরের কর্ত্তৃত্ব ছিল।* তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে একটি প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর এই সমিতিরও একজন সভ্য ছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষায় বলিতে হয়,—"এই উৎসাহী যুবক শিক্ষা-ব্যবস্থাপকের যশ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। বাংলার শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত জমিদারবর্গ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকরা তাঁহাদের নূতন সহযোগীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতিকামী ইংরেজবর্গ একজন সহকর্ম্মী পাইলেন।......সংস্কৃত-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া বিদ্যাসাগর শুধুই যে বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই নয়,—ভারতীয় চিন্তার বাহিরের শক্তিপ্রদ ভাবধারাও তিনি অনায়াসে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সবল স্বাস্থ্যের সহিত সতেজ হৃদয় পাইয়া তিনি সংস্কারের জন্য অবিশ্রান্ত সচেষ্ট ছিলেন।"

কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারই শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের শেষ ও প্রধান কার্য্য নহে।

* এই সভার ১৮৫৩, ৮ই জুলাই তারিখের মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:—"ভবিষ্যতে যে-কোনো গ্রন্থ অনুবাদকরণের অনুমতি হইবে, অনুবাদক আদৌ তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সমাজে সমর্পণ করিবেন। সমাজ তাহার রচনার পারিপাট্য নিরূপণার্থে তাহা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পাদরি জে. রবিনসন্ সাহেবকে সমর্পণ করতঃ তাঁহাদের অভিপ্রায় লইবেন।"

বাংলা-শিক্ষা প্রচলনে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা

তখনকার কালে দেশবাসীর শিক্ষার দিকে ভারত-সরকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। সংস্কৃত ও আরবীর জন্য সরকার কিছু টাকা ব্যয় করিতেন মাত্র। ১৮৩৫, মার্চ্চ মাসে গভর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক মিনিটে লিখিলেন,—"ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারই বৃটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষা-বাবদ সকল মঞ্জুরী অর্থ শুধু ইংরেজী-শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই ভাল হয়।" এই গুরুতর সিদ্ধান্তের দিন হইতে গভর্ন্মেণ্ট ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। বেণ্টিঙ্কের নব ব্যবস্থায় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-সম্পর্কিত অভাবই দূর হইতে পারে। সেই হেতু শিক্ষা-বিষয়ে সাধারণের দাবি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া ত আর দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারা যায় না;—মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই জন-সাধারণ জ্ঞানলাভ করে। এই দিক দিয়া প্রথম প্রচেষ্টার সম্মান স্যর হেনরী হার্ডিঞ্জের প্রাপ্য। দেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, আর্থিক অসচ্ছলতার অসুবিধাসত্বেও, তিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নানাস্থানে (মাসিক ১৮৬৫৲ টাকা ব্যয়ে) ১০১টি পল্লী-পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন (অক্টোবর, ১৮৪৪)।* বিদ্যাসাগর এই কার্য্যে

* ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাস,—*Selections from Educational Records*, Part I (1781-1839) by H. Sharp, and Part II (1840-1859) by J. A. Richey এবং পুস্তকের শেষে প্রমাণপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি এইগুলির শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই-সকল পাঠশালার জন্য শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারী মার্শেল ও বিদ্যাসাগরের উপর ছিল।

কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতির অভাবে হার্ডিঞ্জের প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। চারি বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধায়ক—বোর্ড অফ রেভিনিউ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—"সফলতা অসম্ভব, বাংলা পাঠাশালাগুলির আর কোনো আশা নাই।" তাহার পর হইতে সাধারণের শিক্ষার জন্য সরকার আর বিশেষ কিছু করেন নাই। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার যে এক অসম্ভব কাজ নয়, ভারতবর্ষের অপর এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সে-কথা প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি নির্ব্বাচিত জেলায়, ছোটলাট টমাসন্ কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত দেশীয় ভাষার শিক্ষা-প্রণালী যে অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিয়াছে, ১৮৫৩ সালের প্রারম্ভে তৎসম্বন্ধীয় রিপোর্ট বড়লাটের হস্তগত হইল। * বঙ্গ ও বিহারে এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, সেকথা কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরদের তিনি বিশেষ করিয়া জানাইলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাংলা-সরকারকে ঐ বিষয়ে মতামত জানাইতে অনুরোধ করিলেন (৪ নভেম্বর, ১৮৫৩)। একটি সুসম্বদ্ধ বাংলা শিক্ষা-প্রণালী কি উপায়ে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে এক খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য বঙ্গীয় গভর্ন্মেণ্ট শিক্ষা-পরিষদকে লিখিলেন (১৯ নভেম্বর)। মাতৃভাষায় শিক্ষা-সম্বন্ধে আডাম সাহেবের রিপোর্ট এবং টমাসনের ব্যবস্থাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সেই খসড়া তৈয়ারী করিতে হইবে। ১৮৫৪, ৯ই সেপ্টেম্বর পরিষদ ঐ বিষয়ে সদস্যদিগের মিনিটগুলি বঙ্গীয় গভর্ন্মেণ্টকে পাঠাইলেন।

* Minute by Lord Dalhousie, dated 25 October, 1853.

বাংলায় ছোটলাটের পদ সৃষ্টি হইল (১ মে, ১৮৫৪); প্রথম ছোটলাট হইলেন—ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই মাস পূর্ব্বে শিক্ষা-পরিষদের সদস্যরূপে হ্যালিডে বাংলায় শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার মত একটি মিনিটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন (২৪ মার্চ্চ)। শিক্ষা-পরিষদ-প্রদত্ত কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া হ্যালিডে স্থির করিলেন, তিনি নিজে যে-প্রণালী পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বড়লাটের গ্রহণার্থ ইহাই তিনি অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন (১৬ নভেম্বর)। হ্যালিডের মিনিটের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :—

"২। বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে। ইউরোপীয় এবং এ-দেশীয়—উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়, কারণ শিক্ষকের কার্য্য অতি অযোগ্য লোকের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে।

"৩। এই পাঠশালাগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। এ-বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বতন ছোটলাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই শ্রেয়। পাঠশালাগুলির আদর্শস্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার। নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, গুরুমহাশয়েরা আদর্শের প্রেরণায় ক্রমশ পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরণে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।

"৫। এই বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সুদক্ষ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা এক মন্তব্য সংযুক্ত হইল। একথা সকলেই জানেন, ইনি বাংলা-শিক্ষা প্রচারকার্য্যে বহুদিন হইতেই অত্যন্ত উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য প্রাথমিক পুস্তক-সমূহ রচনা করিয়া এ-সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।

"৬। অধ্যক্ষের মন্তব্যান্তর্গত শিক্ষা-প্রণালী আমি সাধারণভাবে অনুমোদন করি। ইহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাই আমার অভিপ্রেত।

"১৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের, এবং এ-বিষয়ে যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি তাঁহাদের সকলেরই মত এই—সরকারী মডেল স্কুলে প্রবেশ-দক্ষিণা প্রথম-প্রথম কিছু না থাকাই উচিত, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মত এগুলিও নিশ্চয়ই নিজেদের খরচা নিজেরাই চালাইতে পারিবে।

"২৮। শিক্ষক তৈয়ারী করিবার জন্য নর্ম্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু বলি নাই। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ ভাল শিক্ষক গড়িয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত কলেজ বাংলা দেশে নর্ম্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করিয়াছে।"*

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হ্যালিডের মিনিটের মূল উৎস ছিল—বিদ্যাসাগরের নিপুণ মন্তব্য। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে এই মন্তব্যের অন্তর্গত নির্দ্দেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পরবর্ত্তীকালে গৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রয়োজন :—

"১। সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন-না মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

"২। লেখা, পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস,

* হ্যালিডের এবং শিক্ষা-পরিষদের সদস্যগণের মিনিটগুলি—*Selections from the Records of the Bengal Govt.*, No. xxii—Correspondence relating to Vernacular Education (Calcutta, 1855) গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এবং শারীরতত্ত্ব শেখানো প্রয়োজন।

"৩। নিম্নলিখিত প্রকাশিত প্রাথমিক পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে গ্রহণযোগ্য :—

(ক) শিশুশিক্ষা (পাঁচ ভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠন শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ—জ্ঞানোদয়-সম্পর্কিত একখানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ—'চেম্বার্স এডুকেশনাল্ কোর্স'-অন্তর্গত নৈতিক-পাঠ পুস্তকের ভাবানুবাদ।

(খ) পশ্বাবলী, অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণী।

(গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

(ঘ) চারুপাঠ, বা প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়-সমূহ সম্বন্ধে পাঠমালা।

(ঙ) জীবনচরিত—'চেম্বার্স এক্সেম্প্ল্যারি বায়োগ্রাফির' অন্তর্গত কোপার্নিকস্, গ্যালিলিও, নিউটন, স্যর উইলিয়ম হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল, স্যর উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্সের জীবনবৃত্তের ভাবানুবাদ।

"৪। পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী রচিত হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ত্ব, ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচরিত এখনও রচনা করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইলেই চলিবে।

"৫। একজন শিক্ষক হইলে চলিবে না; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত দুইজন করিয়া শিক্ষক চাই। স্কুলগুলিতে সম্ভবত তিনটি হইতে পাঁচটি করিয়া শ্রেণী থাকিবে; কাজেই একজন শিক্ষকের দ্বারা সুশৃঙ্খলায় কাজ চলিবে না।

"৬। গুণ এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে পণ্ডিতদের মাহিনা ন্যূনপক্ষে ৩০্, ২৫্, অথবা ২০্ টাকা হওয়া চাই। পূর্ব্বকথিত পুস্তকগুলি যখন রচিত হইয়া পাঠের জন্য গৃহীত হইবে, তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০্ টাকা বেতনে একজন হেড-পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে।

"৭। শিক্ষকেরা কোথাও না গিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যাহাতে যথানিয়মে বেতন পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"৮। হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারিটি জেলা বর্ত্তমানে কাজের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রয়োজনানুসারে জেলা চারিটির মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যেন তাহার নিকটে কোনো ইংরেজী কলেজ বা স্কুল না থাকে। ইংরেজী কলেজ ও স্কুলের আশপাশে বাংলা-শিক্ষা [illegible]ভাবে আদৃত হয় না।

"৯। কর্ম্মকুশল সুদক্ষ তত্ত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদের উৎসাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফল্য বহুপরিমাণে নির্ভর করে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানোপার্জ্জন সাধারণ দেশবাসীর এখনও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই। এই কারণে, ছোটলাট হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব—যাহা এতদিন চাপা ছিল—দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার।

"১০। তত্ত্বাবধানের নিম্নলিখিত উপায় বিশেষ কার্য্যকর এবং অল্প-ব্যয়সাধ্য হইবে।

"১১। যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ, মাসিক ১৫০্ টাকা বেতনে দুইজন বাঙালী তত্ত্বাবধায়ক রাখা প্রয়োজন;—একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, আর একজন নদীয়া ও বর্দ্ধমানের জন্য। তাহাদের

কাজ হইবে—ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়া, এবং শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করা।

"১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত কোনো পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচা দিলেই চলিবে। এই বাবদ বৎসরে ৩০০৲ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না। তিনি বৎসরে একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিবেন। কর্ত্তৃপক্ষের উপরই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকিবে।

"১৩। গ্রন্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার প্রধান তত্ত্বাবধায়কের উপর থাকিবে।

"১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইয়াও বাংলা শিক্ষক গড়িবার জন্য নর্ম্যাল স্কুলরূপে পরিগণিত হইবে।

"১৫। এমনিভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও গ্রহণ, শিক্ষক-নির্ব্বাচন, এবং সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার একই পদে যুক্ত হইলে, অনেক অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

"১৬। মাসিক একশত টাকা বেতনে, প্রধান তত্ত্বাবধায়কের একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে শিক্ষক-তৈয়ারী ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নে সাহায্য করিবেন এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বাংলা স্কুল-পরিদর্শনে বাহির হইলে তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে কাজ চালাইবেন।

"১৭। গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোনো কাজেরই নয়। যে-কাজে তাহারা অযোগ্য, এই-সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে লওয়াতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয়। তত্ত্বাবধায়কদের কাজ হইবে এই-সকল পাঠশালা পরিদর্শন করা এবং শিক্ষাদানের রীতি সম্বন্ধে গুরুমহাশয়দের যথাসাধ্য উপদেশ

দেওয়া। পূর্ব্বোল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলি সুযোগ-মত যথাসাধ্য প্রবর্ত্তন করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্যালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সেদিকে তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

"১৮। দেশীয় লোক অথবা মিশনরী কর্ত্তৃক স্থাপিত যে-সব স্কুল সুদক্ষ শিক্ষকের হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়কেরা এই-সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া কি রকম উৎসাহ ও সাহায্য তাহারা পাইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

"১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত শহর ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকে গভর্ন্মেণ্ট স্কুলের আদর্শে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে প্ররোচিত করাও তত্ত্বাবধায়কদের এক কর্ত্তব্য হইবে।
৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪।"

হ্যালিডে ব্যয়বাহুল্য বর্জ্জন করিবার ইচ্ছায় ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানের সমর্থন করেন নাই। তিনি মিনিটে লিখিয়াছিলেন,—

"জানি, মাথার উপর কোনো ইউরোপীয় না থাকিলে দেশীয় তত্ত্বাবধায়কদের বেশী বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা একজন অসাধারণ লোক, তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দেখিলে আমি আনন্দিত হইব। পরীক্ষার ফল কি হয়, তাহা দেখিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক এবং আমি সত্যই মনে করি, ইহাতে তিনি সফল হইবেন।"

কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের সদস্যদের অনেকেই—রামগোপাল ঘোষ, স্যর জেম্‌স কোল্‌ভিল, প্রভৃতি—এ প্রস্তাবের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদের গুরুভারের কথা স্মরণ করিয়া বিদ্যাসাগরকে

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক করিবার প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মতি দেন নাই। সংস্কৃত কলেজ হইতে তাঁহাকে ছাড়িতে না চাহিলেও, তাঁহারা স্থির করেন যে, "এই মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কোন-না-কোনরূপ যোগ থাকা উচিত। পুস্তক, শিক্ষক এবং স্থানের নির্ব্বাচন, শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর নানা বিষয় সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ খুবই মূল্যবান হইবে।" কিন্তু হ্যালিডে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কোনো বাধাই তাঁহাকে সে-কাজে বিচলিত করিতে পারিত না। ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

বিদ্যাসাগরের শক্তি সম্বন্ধে হ্যালিডের একটা শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা হইতে বন্ধুত্বের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া শিক্ষা-সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেন। বাংলার ছোটলাটের আসনে বসিবার পরই, হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলির স্থান-নির্ব্বাচনের ভার দিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ১৮৫৪, ৩রা জুলাই ছোটলাটকে তিনি যে রিপোর্ট দেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি ২১এ মে হইতে ১১ই জুন পর্য্যন্ত, সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময়, হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাঁতিহাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই-সকল গ্রামের অধিবাসীরা স্কুল-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। এমন কি তাহারা নিজ খরচায় স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরাইয়া আসায় বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার অন্যান্য স্থান, অথবা নদীয়া, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগণায় যাইতে পারেন নাই। যাইতে না পারিলেও, স্কুল-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগুলির সম্বন্ধে তিনি নানারূপ সংবাদ আহরণ

করিয়াছিলেন। পত্রের শেষে তিনি লিখিতেছেন,—"বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য যেমনি অনুমতি পাওয়া যাইবে, স্কুল-ঘর তৈয়ারী করিবার জন্য দু-তিন মাস অপেক্ষা না করিয়া, আমার নির্ব্বাচিত স্থানগুলিতে অমনি যেন স্কুল খোলা হয়।"*

বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা শেষে বুঝিতে পারিলেন ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বটে। ১৮৫৪, ১৯এ জুলাই বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের সভাপতি, স্যর চার্লস্ উড, 'ভারতের শিক্ষা-বিষয়ক চার্টার' নামে পরিচিত, বিখ্যাত পত্রখানি স্বাক্ষর করিলেন। ১৮৫৫, জানুয়ারি মাসে বাংলায় কাজ আরম্ভ লইল; শিক্ষা-পরিষদের বদলে ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ বাহাল হইলেন। কিছুদিন পরেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার উপায়-নির্দ্ধারণার্থ এক ইউনিভার্সিটি কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর এই কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।† কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদ্যাসাগর ইহার 'ফেলো' মনোনীত হন।‡

হ্যালিডের মিনিটে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের পত্রে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যবস্থার নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু ক্রমশ অগ্রসর হইবার দিকে বড়লাটের ঝোঁক থাকায় তিনি প্রথমে কয়েকটি জেলা লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যদি সংস্কৃত কলেজের কাজের কোনো ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে

* Ishwarchandra Sharma to Capt. H. C. James, Private Secretary to the Lieut.-Governor of Bengal, dated 3 July 1854. —*Education Con. 19 Octr. 1854*, No. 118.

† Letter to Pandit Ishwarchandra Sharma, dated 26 January, 1855.—*Public Con. 26 Jany. 1855*, No. 154, also No. 153.

‡ *Public Procdgs. 12 Decr. 1856*, p. 7.

বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য বাহির হইতে পারেন, এ-সম্বন্ধে বড়লাটের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিলাতের পত্র অনুসারে তাঁহাকে বাংলা-শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট করা যায় না ;—এ কার্য্য ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ এবং তদধীন ইন্‌স্পেক্টর দ্বারা চালিত হইবে। *

ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ নিযুক্ত হইলেন। তবু হ্যালিডে অনুভব করিতে লাগিলেন, যদি বঙ্গদেশে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা সফল করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের মত লোকের সাহায্য ব্যতীত সে কার্য্য অসম্ভব। ডিরেক্টরকে লিখিত বাংলা-গভর্ন্মেণ্টের একখানি পত্রে প্রকাশ :—

"শিক্ষা-বিভাগের নূতন ব্যবস্থাসত্ত্বেও, অন্তত কিছুকালের জন্য, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত বিশিষ্টরূপ গুণবান্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা শ্রেয়স্কর, ইহাই ছোটলাটের মত। অধ্যক্ষ-হিসাবে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তব্য কোনরূপ প্রতিবন্ধ না হয়, অথচ এ কাজে তাঁহার প্রয়োজনীয় সাহায্য কি করিয়া পাওয়া যায়, সে-সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে ছোটলাট অনুরোধ করিতেছেন।" (২৩ মার্চ্চ, ১৮৫৫) †

উত্তরে ডিরেক্টর প্রস্তাব করিলেন, স্থায়ী কর্ম্মচারী—মিঃ প্র্যাটকে না পাওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরকে অস্থায়িভাবে ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলের কাজে লাগানো যাইতে পারে। এ প্রস্তাব কিন্তু ছোটলাটের মনঃপূত হইল না। তিনি মিনিটে লিখিলেন—

* Letter from C. Beadon, Secy. to the Govt. of India, to W. Grey, Secy. to the Govt. of Bengal, dated 13 Feb. 1855.

† *Education Con. 10 May 1855*, No. 71.

"অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়া কোনোই লাভ নাই। ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়চিত্ত লোক। বাংলা-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি জোরালো মতামত আছে। যদি তাঁহার মতলব অনুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহ ও বিচার-বুদ্ধি সহকারে মঞ্জুরী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিবার কার্য্যে লাগিয়া যাইবেন। তিন মাসে হোক আর তিন সপ্তাহে হোক, মিঃ প্র্যাট যেমনি আসিবেন অমনি সরিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ অস্থায়িভাবে যদি তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তবে তিনি যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন, এমন আমার বোধ হয় না।

"আমার নির্দ্ধারিত যে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা ভারত-গভর্ন্মেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, তাহাতে তিন-চারিটি জেলার উল্লেখ আছে। সেই জেলাগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত নির্দ্দিষ্ট বেতনে প্রতিনিধি-সাব-ইনস্পেক্টর রূপে ঈশ্বরচন্দ্রকে যদি নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে আমি কোনো আপত্তির কারণ দেখি না। ইহাতে মিঃ প্র্যাটের কাজে বাধা পড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বরচন্দ্রের কার্য্যের পরিদর্শন ছাড়াও, যে-সব জেলা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র, সেই-সব স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী ও ইঙ্গ-বঙ্গ স্কুল ও কলেজ সমূহের ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে তাঁহার করিবার কাজ যথেষ্টই থাকিবে।

"বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি গুরুতর বিষয়। বহু কষ্টস্বীকার এবং যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া যাহা ঠিক করিয়াছি, সেই ব্যবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের একজন প্রধান উদ্যোগীকে যদি এমন কাজে নিযুক্ত করা হয় যাহাতে নানাভাবে প্রতিহত হইবার আশঙ্কা আছে, এবং তাঁহাকে ভুলপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি সেই ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিবার দিকে

লইয়া যাওয়া হয়, তবে সত্যই তাহা দুঃখের কথা।" (১১ই এপ্রিল, ১৮৫৫)*

১৮৫৫, ২০এ এপ্রিল তারিখে বাংলা-সরকার ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন্‌কে এই সুরে পত্র লিখিলেন,—

"ছোটলাট পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে ঐরূপ একটা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার বিরোধী। অতি অল্পদিনের কাজে পণ্ডিত কোনকিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এরূপ নিয়োগ তাঁহার চরিত্র ও গুণের যোগ্য হইবে না। যে-কোনো মুহূর্ত্তে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—এমন অস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে পণ্ডিতের প্রতি সরকারের অবিচার হইবে।

"ছোটলাটের মত এই, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকে এখনই অনুমোদিত ব্যবস্থা-অনুসারে কাজ করিতে নির্দ্দেশ করা হোক। পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তিন-চারিটি জেলা কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লওয়া হোক। ইহাতে—অন্তত এই সময়টায়—পণ্ডিতের কলেজের কাজে বিশেষ বাধা জন্মিবে না।... সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার কালে মাসিক দুই শত টাকা এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন।"†

ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন্‌ তখনই বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের পরামর্শ করিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়-সমূহের সহকারী

* *Education Con. 10 May 1855*, No. 73.
† *Education Con. 10 May 1855*, No. 74.

ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত করা হইল ; ১৮৫৫, ১লা মে হইতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার উপর এই কাজে মাসে দুই শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। নিযুক্ত হইয়াই তিনি নিজের সাব-ইনস্পেক্টর * বাছিয়া লইলেন, এবং মডেল স্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মফঃস্বলে পাঠাইলেন। প্রস্তাবিত নূতন বাংলা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-নির্ব্বাচনই হইল তাঁহার প্রথম কাজ। তিনি জানিতেন, এই-সব শিক্ষকের উপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সংস্কৃত কলেজে বাংলা শিক্ষক নির্ব্বাচনের একটি পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া তিনি ১৮৫৫, মে মাসে নোটিস বাহির করিলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে দুই শতেরও অধিক পদপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল। দেখা গেল, আর কিছু শিক্ষা না পাইলে তাহাদের মধ্যে অতি অল্পলোকই সরকারী মডেল স্কুলগুলির ভার লইতে সমর্থ হইবে। এমনি করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্ম্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। 'পাঠশালা' নামে একটি বাংলা স্কুল পূর্ব্বে হিন্দু কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে সেটি যাহাতে তাঁহার তত্ত্বাবধানে আসে, বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় ছিল তাহাই। তিনি ডিরেক্টরকে বলিলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কাজে লাগিবে। যাহারা মফঃস্বল বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক হইতে চায়, তাহারা 'পাঠশালা'র শিখাইবার ও পরিচালন করিবার পদ্ধতি দেখিয়া ও কখনও কখনও নিজেরাও পড়াইয়া, শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে। শুধু

* হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এবং বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। ইঁহাদের বেতন ছিল—পথ-খরচা ছাড়া মাসিক এক শত টাকা।

তাই নয়, তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ মডেল স্কুলে পরিণত করা যাইতে পারে। ডিরেক্টরকে লিখিত ১৮৫৫, ২রা জুলাই তারিখের পত্রে * বিদ্যাসাগর নর্ম্মাল স্কুল-স্থাপনে তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই চিঠিতে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে লেখা আছে :—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নর্ম্মাল ক্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আছেন; অক্ষয়-কুমার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অন্যতম। ইংরেজীতে তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ-সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ; শিক্ষকতা-কার্য্যেও তিনি পটু। মোট কথা, তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই। ··· দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি।"

বাংলা স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছিল। বঙ্গীয় গভর্ন্মেণ্ট এবং ডিরেক্টর উভয়েই পণ্ডিতের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ছয় মাস অন্তর ৬০টি করিয়া গুণী শিক্ষক স্কুল হইতে বাহির হইবে; তুলনায় মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় কিছুই নয়। † ১৮৫৫, ১৭ই জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্ম্মাল স্কুল খোলা হইল।

স্বতন্ত্র বাড়ি না পাওয়ায় নর্ম্মাল স্কুল সকালবেলা দুই ঘণ্টার জন্য সংস্কৃত কলেজেই বসিত। স্কুলটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চশ্রেণীর ভার—

* *Education Con. 12 July 1855*, No. 89.
† *Ibid.*, Nos. 88, 90.

প্রধান শিক্ষক সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্নশ্রেণীর ভার ছিল—দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতির উপর। ৭১টি ছাত্র লইয়া প্রথম স্কুল খোলা হয়; তন্মধ্যে ৬০জনকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত। ১৭ বছরের কম, অথবা ৪৫ বছরের বেশী, বয়সী ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হইত না। প্রথম প্রথম কেবল উচ্চ জাতির লোককেই লওয়া হইত। 'বোধোদয়', 'নীতিবোধ', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী', 'চারুপাঠ' ও 'বাহ্যবস্তু' পড়ানো হইত। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পাঠ দেওয়া হইত। মাসে মাসে পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা ছিল। অমনোযোগী ছাত্ররা বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত, এবং পাঠে অগ্রসর ছাত্ররা শিক্ষকরূপে নির্ব্বাচিত হইত।

১৮৫৬, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁহার এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পিছু মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়িত। বিদ্যালয়-গৃহ গ্রামবাসীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের নির্দ্দেশ ছিল, ছয়মাস পর্য্যন্ত ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইবে না, তাহার পর কিন্তু সম্ভব হইলে মাহিনা আদায় করা হইবে।

অক্লান্তকর্ম্মা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্ম্মাল স্কুল, চারি জেলার মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬, নভেম্বর মাসে তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভারত-সরকারের নির্দ্দেশে, পূর্ব্বতন নাম বদলাইয়া সে পদের নাম হইল—দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়-সমূহের স্পেশ্যাল্ ইন্‌স্পেক্টর।*

* *Education Cons. 27 Nov. 1856*, No. 92; *16 Octr. 1856*, Nos. 65-66.

সার হেনরি হার্ডিঞ্জের স্থাপিত স্কুলগুলি সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়াও বিদ্যাসাগর দমিলেন না। তিনি মডেল স্কুল-গুলিকে সার্থক করিবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নেও তিনি লাগিয়া গেলেন। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সুফলপ্রসূ না হইয়া পারে না। কার্য্য-সূচনার তিন বৎসর পরে তিনি যে রিপোর্ট লিখিলেন, তাহাতে সফলতার পরিচয় পাওয়া যায়।—

"প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ সকল বাংলা পাঠ্যপুস্তকই পাঠ করিয়াছে। ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েও তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে।

"গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফঃস্বলের লোকেরা মডেল স্কুলগুলির মর্ম্ম বুঝিবে না। প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সার্থকতা এই সন্দেহ দূর করিয়াছে। যে-যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই-সব গ্রামের এবং তাহাদের আশপাশের পল্লীবাসীরা এই বিদ্যালয়গুলি অতি উপকারী বলিয়া মনে করে; ইহার জন্য সরকারের কাছে তাহারা কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে, ছাত্র-সংখ্যাই তাহার প্রমাণ।" *

বিদ্যাসাগরের যত্ন-চেষ্টায় অনেকগুলি বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাইকপাড়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত (১ এপ্রিল, ১৮৫৯) কাঁদির ইংরেজী-সংস্কৃত স্কুল তাহাদের অন্যতম। কিছুদিন তিনি ইহার অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে

* *General Report on Public Instruction*, etc., for 1857-58, App. *A*, pp. 178-80.

"এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠোপযোগী এক সংস্কৃত সহিত ইংরেজী স্কুল" প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে দুইজন স্থানীয় ভদ্রলোক আর্থিক সাহায্যের জন্য তাঁহাকে লিখিলে তিনি অবিলম্বে তাঁহাদের জানাইয়াছিলেন,—"আপনাদিগের উদ্যোগে ঘাটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনাটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন তজ্জন্য অন্য চেষ্টা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই।" (৬ই জুলাই, ১৮৬৮)† স্বগ্রামে তিনি বালকদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন (১৮৫৩)। দক্ষিণ-বাংলার স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর লজ্‌ সাহেব বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

"বীরসিংহ বিদ্যালয় :—এই স্কুলটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত। একথা না বলিলে এই সুবিখ্যাত জনহিতৈষীর প্রতি অবিচার করা হয়; স্কুল-গৃহের জন্য তিনি বেশ উপযোগী স্থানে একখানি সুন্দর বাংলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ছয়-সাতজন শিক্ষকের বেতন তিনি নিজেই দেন। ছাত্রদের নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনামূল্যে তাহাদের সকল-রকম বই দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতের নিজের বাড়ীতে প্রায় ৩০জন দরিদ্র ছেলের আহারের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে; দরকার পড়িলে বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত যোগানো হয়। অসুখে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়; সকলের সম্বন্ধেই এমন যত্ন লওয়া হয় যেন প্রত্যেকেই পরিবারের একজন।

† বিহারীলাল সরকার লিখিত "বিদ্যাসাগর" পুস্তকের ৪৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় এই সংক্রান্ত পত্র দুইখানি মুদ্রিত হইয়াছে।

"এখানে সংস্কৃতই প্রধান পাঠ্য। উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী এবং নিম্ন শ্রেণীতে বাংলাও পড়ানো হয়। স্কুলে আটটি শ্রেণী আছে। ছাত্র-সংখ্যা ১৬০। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা ইংরেজীতে ভালই পরীক্ষা দিয়াছিল, তবে তাহাদের উচ্চারণ শুদ্ধ নয়।

"বাংলা সম্বন্ধে ছেলেরা বিশেষ মনোযোগ দেয় না। বাংলায় লেখা বিজ্ঞানের বই চালাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছি। ছেলেরা সংস্কৃত ভালই জানে।" *

শেষজীবনে বিদ্যাসাগর শহরের কর্ম্মকোলাহল হইতে মাঝে মাঝে মধুপুরের নিকট কার্ম্মাটাঁরের নির্জ্জন সাঁওতাল পল্লীতে আসিয়া বাস করিতেন। কার্ম্মাটার ষ্টেশনের ধারেই বাগান-বাগিচা-সমেত তাঁহার বাংলাখানির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবেশী অসভ্য সাঁওতালদের তিনি এতই ভালবাসিতেন যে তাহাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য নিজব্যয়ে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার মাসিক কুঁড়ি টাকা ব্যয় হইত

* E. Lodge, Inspr. of Schools, S. Bengal to the Offg. D. P. I., dated 20 May 1859. *Appendices to Genl. Report on Public Instruction* etc. for 1858-59, ii. 84-85.

পরিশিষ্ট

বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মডেল বা আদর্শ বিদ্যালয় *

নদীয়া

বেলঘোরিয়া	মডেল স্কুল	প্রতিষ্ঠার তারিখ	...	২২ আগষ্ট, ১৮৫৫
মহেশপুর	ঐ		...	১ সেপ্টেম্বর „
ভজনঘাট	ঐ		...	৪ ঐ „
কুশদহ, বা খানটুরা	ঐ		...	১১ ঐ „
দেবগ্রাম	ঐ		...	১২ ঐ „

বর্দ্ধমান

আমাদপুর	মডেল স্কুল	...	২৬ আগষ্ট, ১৮৫৫
জৌগ্রাম	ঐ	...	২৭ ঐ „
খণ্ডঘোষ	ঐ	...	১ সেপ্টেম্বর „
মানকর	ঐ	...	৩ ঐ „
দাঁইহাট	ঐ	...	২৯ অক্টোবর „

হুগলী

হারাপ	মডেল স্কুল	...	২৮ আগষ্ট, ১৮৫৫
শিয়াখালা	ঐ	...	১৩ সেপ্টেম্বর „
কৃষ্ণনগর	ঐ	...	২৮ ঐ „
কামারপুকুর	ঐ	...	২৮ ঐ „
ক্ষীরপাই	ঐ		১ নভেম্বর „

মেদিনীপুর

গোপালনগর	মডেল স্কুল	...	১ অক্টোবর, ১৮৫৫
বাসুদেবপুর	ঐ	...	১ ঐ „
মালঞ্চ	ঐ	...	১ নভেম্বর „
প্রতাপপুর	ঐ	...	১৭ ডিসেম্বর
জকপুর	ঐ	...	১৪ জানুয়ারি ১৮৫৬

---

* *Education Cons. 24 Jany., 1856*, No. 82; *13 Mar. 1856*, No. 79.

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর

এক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনিলে আমাদের রক্ষণশীল দেশবাসী ভীত হইয়া পড়িত। ছেলেদের মত মেয়েদেরও যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। রামমোহন রায় প্রথম মনে করাইয়া দিলেন স্ত্রীলোক বুদ্ধিহীনা নহে। তিনি লিখিলেন,—

"বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট-রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্ব শাস্ত্রের পারগ রূপে বিখ্যাত আছে…।"*

বিদ্যাসাগর কর্ম্মী। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি জানিতেন, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ভিন্ন দেশবাসী এক পাও অগ্রসর হইবে না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" পুত্রের মত কন্যাকেও যত্নের সহিত পালন করিতে এবং শিক্ষা দিতে হইবে। শাস্ত্রবচনকে মূলমন্ত্র করিয়া বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনে ব্রতী হইলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার সরকার নিজের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। ইতিপূর্ব্বেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহোদয়

---

* সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, (রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০৫)

এবং খৃষ্টান মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু সূচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্তৃক একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন হইতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়; পরে 'বীটন নারী বিদ্যালয়'—এই নূতন নামকরণ হয়। গোড়া হইতেই বিদ্যাসাগরকে সহকর্ম্মী এবং উৎসাহী বন্ধু রূপে পাইবার সৌভাগ্য বীটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম পরিচিত হন। ঈশ্বরচন্দ্রকে একজন অক্লান্তকর্ম্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগরকেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক-রূপে কাজ করিবার জন্য ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০)। আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ীর দুইপাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—মনুসংহিতার এই শ্লোকাংশ খোদিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরেই বীটন পরলোকগত হন (১২ আগষ্ট, ১৮৫১)। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ড্যালহাউসি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের (মার্চ্চ, ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল, এবং বঙ্গের ছোটলাট ইহাকে সিসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১৮৫৬, ১২ই আগষ্ট তারিখের পত্রে বীডন সাহেব বাংলা-সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নজরে বিশেষ করিয়া পড়ে, এবং তাঁহারা যাহাতে এই বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই পত্রে ছিল। একটি কমিটি করিবার প্রস্তাবও পত্রে ছিল। কমিটির

সদস্যরূপে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাঁহার উপর স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার দিবার জন্য বীডন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোটলাটকে লিখিলেন:—
"কমিটির সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহার সামাজিক সম্মান ও স্কুলের সম্পাদক হিসাবে পূর্ব্ব পরিশ্রম তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে।"*

বাংলা-সরকার সম্মত হইলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি, ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।†

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের মত বিদ্যাসাগরও স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনিও মনে করিতেন স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতা শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে ও অন্যত্র বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্যা। সেই সমস্যা-সমাধানের উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলা দেশে হ্যালিডে সাহেব সেই কাজে হাত দিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া, তাঁহার সহিত এ-সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিলেন। কাজ কেমন কঠিন সে কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সম্ভ্রান্ত

* *Education Con. 4 Sept. 1856*, No. 166.

† Bengal Government to Vidyasagar, dated 30 Augt. 1856.-*Education Cons. 4 Sept. 1856*, Nos. 168 & 170.

হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাঁহারা ভালরূপেই বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজে লাগিলে এরূপ সৎকার্য্যে জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না।

বিদ্যাসাগর অল্পদিনের মধ্যেই জানাইলেন, বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০ মে, ১৮৫৭)।* ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারের কাছে ৩২৲ টাকা মাসিক সাহায্যের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন।

দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য তিনখানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি পূর্ব্বেই সরকারের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দোয়ারহাটা ও বৈদ্যবাটী থানার অন্তর্গত গোপালনগর, এবং বর্দ্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সেই তিনখানি আবেদন-পত্রে ছিল। ছোটলাট সকল দরখাস্তই মঞ্জুর করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পল্লীবাসীরা বিদ্যালয়-বাটী নির্মাণ করিয়া দিবার ভার লইল। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময় ছোটলাট জানিতে চাহিলেন, বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টারদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোনো আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রার্থনাও তিনি পূর্ণ করিবেন।†

* Vidyasagar to D. P. I., dated 30 May, 1857.—*Education Con. 22 Oct. 1857*, No. 72.

† Govt. of Bengal to the Offg. D. P. I., dated 21 Octr. —*Education Con. 22 Oct. 1857*, No. 74.

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের ভাব বিদ্যাসাগরের কাছে ভাল বলিয়াই মনে হইল। তিনি পূর্ব্বেই বালকদের জন্য মডেল বাংলা বিদ্যালয়গুলি কার্য্যকর ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইবার বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মডেল বাংলা বিদ্যালয়-সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন, সরকার তাঁহার মতলব সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এই ধারণার বশে তিনি নিজ এলাকাভুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই-সব বিদ্যালয়-স্থাপনার সংবাদ তিনি যথাসময়ে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের কাছে পাঠাইয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডিরেক্টরও পূর্ব্বেকার আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য আবেদন-পত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পত্রগুলিও ছোটলাটের বিবেচনার্থ পাঠাইলেন।

নভেম্বর, ১৮৫৭ হইতে মে, ১৮৫৮—এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্দ্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে তিনটি, ও নদীয়ায় একটি। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫৲ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০। *

১৮৫৮, ১৩ই এপ্রিল বাংলার ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয়ের সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আসিয়াছে। সরকারী সাহায্যদান সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আর একটু ঢিলা না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে

---

* *Education Con. 5 Aug. 1858*, No. 16.

পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১৮৫৬, ১লা অক্টোবর তারিখের পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছোটলাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, যখনই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং অন্তত কুড়িটি ছাত্রী ভর্ত্তি হইবে এমন একটা আশা পাওয়া যাইবে, তখনই স্কুল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন।

১৮৫৮, ৭ই মে তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করিতে অস্বীকৃত হইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল।

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশে বিদ্যাসাগরের কাজে একান্ত বাধা জন্মাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, আর সরকার অন্য-সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন বুঝিলেন, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্কুলগুলি অবিলম্বে উঠাইয়া দিতে হইবে। আর এক সমস্যা—শিক্ষকদের বেতন। প্রতিষ্ঠাবধি স্কুল হইতে তাঁহারা মাহিনা পান নাই। ১৮৫৮, ৩০এ জুন পর্য্যন্ত ধরিলে তাঁহাদের সকলের মোট পাওনা হয়—৩৪৩৯৶৫।

এই সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্রের ২৪এ জুন তারিখের পত্রখানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। পত্রখানির মর্ম্ম দেওয়া গেল:—

"হুগলী, বৰ্দ্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ তৈয়ারী করাইয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্ত্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি, সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।

"সরকারী আদেশ পাইবার পূর্ব্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা-সরকার এ-বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের কর্ম্মচারিবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে,—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।"*

ডিরেক্টর বাংল-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের কথা জানাইয়া বলিলেন,—

"পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেন-না স্ত্রীশিক্ষা-সম্পর্কে এই কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাবৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই

* *Education Con. 5 August 1858,* No 15.

সম্ভব। দূরবর্ত্তী স্থানের অন্যবিধ কর্ত্তব্যের গুরুভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, কর্ত্তৃত্বের বিশেষ উচ্চপদেও যিনি অবস্থিত ন'ন, এমন একব্যক্তি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীতও গ্রাম-সমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পাইলে সেইদিকে কতটাই না তিনি করিতে পারিতেন? আর যদি আন্তরিক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও ইহাতে সেই কর্ম্মচারীর অপমান ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আসিয়া পড়িবে?" *

ছোটলাট ডিরেক্টরের অনুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং "সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের" কথা উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে ব্যাপারটা পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। (২২ জুলাই, ১৮৫৮) †

কোনো আদেশ দিবার পূর্ব্বে, ভারত-সরকার জানিতে চাহিলেন, "পণ্ডিত কেন ও কিরূপ অবস্থায় টাকা মঞ্জুর হইবে ধরিয়া লইয়া, বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে এত ভারী রকমের খরচ করিতে উৎসাহশীল হইলেন। আর যে-উৎসাহ পাইয়া পণ্ডিত বলিতেছেন, তিনি এই-সব কাজ করিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী কে? বাংলা-সরকারের ১৮৫৮, ১৩ই এপ্রিল লিখিত পত্রের পূর্ব্বেই প্রায় অর্দ্ধেক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বাংলা-সরকারের জানা ছিল কি না? থাকিলে, সে কথা উল্লেখ করা হয় নাই কেন?"

ভারত-সরকারের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর ডিরেক্টর অফ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনকে লিখিলেন:—

* *Education Con.* 5 *August*, 1858, No. 14.

† *Ibid.*, No 17.

"সরকারের মঞ্জুরীতে পূর্ব্বেই এইরূপ ভিত্তির উপর কতকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। আমিও তাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম সরকার সাধারণভাবে ইহা অনুমোদনই করেন। প্রত্যেক নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার সংবাদ যে-মাসে খোলা হইল ঠিক তাহার পরের মাসেই আপনাকে জানাইয়া আসিয়াছি। যদিও কোনো লিখিত আদেশ পাস করা হয় নাই, তবুও স্কুলের ব্যয়-সংক্রান্ত আমার নিবেদন-পত্রগুলি সকল সময়েই গ্রাহ্য হইয়াছে। সরকারের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতেছি—ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস-বশে আমি এতদিন যে কাজ করিতেছিলাম তাহাতে কোনদিন আমাকে নিরুৎসাহিত করাও হয় নাই।" (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮) *

ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের পত্রখানি বাংলা-সরকারের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মন্তব্য করিলেন :—

"কলিকাতা হইতে আমার অনুপস্থিতিকালে পণ্ডিত ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ-আলাপে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন,—ইহাই আমার জানা ছিল। আপনার ২১এ অক্টোবরের পত্র হইতে অনুমান করিয়াছিলাম যে সরকার তাঁহার কার্য্য সুদৃষ্টিতেই দেখেন; সেই হেতু পণ্ডিতের রিপোর্টগুলি সরকারকে পাঠাইতে বিলম্ব করি নাই, সেগুলির উপর কোনো মন্তব্য করি নাই, কিংবা তাঁহাকে নিরুৎসাহও করি নাই। আমার অনুপস্থিতিতে মিঃ উড্রোও তাহাই করিয়াছেন।" (৪ অক্টোবর, ১৮৫৮)

ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে সমস্ত কথা পরিষ্কারভাবে খুলিয়া বলিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন, "ব্যাপারটি আগাগোড়া এক

* *Education Con. 2 Decr. 1858*, No. 4.

ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ছোটলাট হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই একটি ভ্রান্ত ধারণার বশে কাজ করিয়াছেন। সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যাপারটিকে যেন একটু অনুগ্রহের চক্ষে দেখা হয়, এইটুকু তিনি আশা করেন।" (২৭ নভেম্বর, ১৮৫৮) *

সরকার পণ্ডিতের উপর সুবিচার করেন নাই এবং সরকারের কাজে যে আর্থিক দায়িত্ব তিনি নিজে লইয়াছিলেন, সে দায়িত্ব তাঁহার ঘাড়েই পড়িয়াছিল, সরকার তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হন,—এই গল্প বিদ্যাসাগরের জীবনী-লেখকগণই রচিয়াছেন। ভারত-সরকারের ১৮৫৮, ২২শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এ-সম্বন্ধে শেষ আদেশ প্রদত্ত হয়। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বিদ্যাসাগর যে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই টাকা যে সমস্তই পরিশোধ করা হইয়াছিল, এই পত্রই তাহার নিশ্চিত প্রমাণ। ভারত-সরকার লিখিতেছেন,—

"দেখা যাইতেছে পণ্ডিত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ করিতে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের উৎসাহ এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই-সকল কথা বিবেচনা করিয়া, এই বিদ্যালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯৵৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার দায় হইতে সপরিষদ বড়লাট সাহেব তাঁহাকে মুক্ত করিতেছেন। সরকার এ টাকা দিবেন, ইহাই তাঁহার আদেশ।

"পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির, অথবা সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত সরকারী বিদ্যালয়গুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কোনো স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

---

* *Education Con. 2 Decr. 1858,* No. 6.

সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগণায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য অনধিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্যও ইহাতে অনুরোধ থাকিবে। সেই টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাহায্যার্থ এবং কিয়দংশ সরকার-সমর্থিত কতকগুলি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হইবে।" *

কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সিপাই-বিদ্রোহের জন্য আর্থিক অনটনবশতঃ বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে কোনো স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন ;—তবে আশা দিলেন, বিষয়টা ভবিষ্যতে বিবেচিত হইবে।

১৮৫৮, নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শোনা যায়, বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ব্যাপারে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের সহিত মতান্তরই না-কি তাঁহার পদত্যাগের অন্যতম কারণ। মাসিক ৫০০৲ টাকার আয় হ্রাস, সরকারের সাহায্যদানে অসম্মতি,—এ-সব কিছুতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের জন্য তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেন। ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ রায় প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্ম্মচারীরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা যে দেশবাসীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছে তাহা স্যর বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

"শুনিয়া সুখী হইবেন, মফঃস্বলের যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার

* *Education Con. 20 Jany. 1859*, No. 9.

নিকটবর্ত্তী জেলা-সমূহের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্কুলও খোলা হইতেছে।”

ছোটলাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫৲ টাকা সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন-স্কুল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪, জানুয়ারি মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাকে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাঁহার বেশী ছিল না, তবুও বীটন বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ১৮৬২, ১৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বাংলা-সরকারকে বীটন বিদ্যালয়-সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠান। তাঁহার সম্পাদক থাকিবার কালে বিদ্যালয়ের অবস্থা কেমন ছিল, তাহার আভাস এই রিপোর্টে পাওয়া যায়ঃ—

“পঠন ও লিখন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ, এবং সূচিকার্য্য শিক্ষণীয় বিষয়। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, দুইজন সহকারিণী এবং দুইজন পণ্ডিত—এই পাঁচজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।......

“কমিটির মত এই, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে......বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস করেন, যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদরলাভ করিতেছে। বড়লোকেরা এখনও সাক্ষাৎভাবে বীটন বিদ্যালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় নাই; এই শ্রেণী হইতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশলাভ করিয়াছে। অনেক সম্পন্ন-ঘরেই কিন্তু মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে,—ইহা দেখিয়া

কমিটি আনন্দানুভব করিতেছেন। বিশেষভাবে বীটন স্কুলের হিতকর প্রভাবই যে ইহার কারণ—ইহাই কমিটির বিশ্বাস।" *

মিস মেরী কার্পেণ্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী কর্ম্মী ও ভারত-বন্ধু বলিয়া সুপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষার প্রচার ছিল তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। বিদ্যাসাগর যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে একজন বড় কর্ম্মী, একথা সুবিদিত। মিস্ কার্পেণ্টার কলিকাতা পৌঁছিয়াই পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন অ্যাটকিনসন্ সাহেব বে-সরকারী পত্রে বিদ্যাসাগরকে জানাইলেন,—

"প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,—মিস কার্পেণ্টারের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইতে, এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে ইচ্ছুক…। (২৭ নভেম্বর, ১৮৬৬)

ডিরেক্টর বীটন বিদ্যালয়ে মিস কার্পেণ্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রথম আলাপেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিকা-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিলেন। ১৮৬৬ ডিসেম্বর মাসে ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন্, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস কার্পেণ্টার উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে বিদ্যাসাগরের বগী গাড়ি উল্টাইয়া যায়। তিনি পড়িয়া গিয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি শেষে ১৮৯১, জুলাই মাসে তাঁহাকে মৃত্যুপথে লইয়া যায়, এই দারুণ আঘাতই তাহার মূল কারণ। কিন্তু

---

* *Education Con. Decr. 1862*, Nos. A. 59-62.

বিদ্যাসাগর এই স্বাস্থ্যহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না,—প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ বীটন বিদ্যালয়েই একটি নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য মিস কার্পেণ্টার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম. এম. ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্য লোক এই আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। মিস কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের ঔচিত্য বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর, ১৮৬৬)। বিদ্যাসাগরও ইহাতে আহূত হইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিদ্যাসাগর তাহার একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর কমিটিভুক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন; তিনি লিখিয়া পাঠান :—

"আমার মতে, কোন-কিছু করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যাপারে যাঁহারা অনুরাগী, সমাজের সেই-সব মান্যগণ্য ব্যক্তির মতামত জানা উচিত ছিল। কিন্তু সভাতে তাঁহাদিগকে আহ্বানই করা হয় নাই, এবং তাঁহাদের সাহায্যও চাওয়া হয় নাই; এ অবস্থায় সরকারের নিকট প্রস্তাবিত আবেদনে আমার নাম সংযুক্ত রাখা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমাকে সভায় উপস্থিত হইতে বলা হয়, তখন সোজাসুজি ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে মিস কার্পেণ্টারের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য; তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই যে উহা যথারীতি সভা হইবে অথবা এরূপ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা এত সংক্ষেপ হইতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি এমনই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম যে সভার আলোচনায়

যোগদান অথবা আলোচ্য বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এ অবস্থায় দুঃখের সহিত আমি কমিটি হইতে আমার নাম প্রত্যাহার করিতেছি।” (৩ ডিসেম্বর, ১৮৬৬) *

১৮৬৭, ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘপত্রে বাংলার ছোটলাট স্যর উইলিয়ম গ্রে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। এ-প্রস্তাবে পণ্ডিত সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি উত্তরে ছোটলাটকে লিখিলেন,—

“আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বীটন বিদ্যালয়েই হোক বা স্বতন্ত্রভাবেই হোক, হিন্দু-সমাজের গ্রহণোপযোগী একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করিবার জন্য মিস কার্পেণ্টার যে-উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন,—এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই! বস্তুতঃ, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী ; যতই ভাবিতেছি, আমার এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে। ইহা সে সাফল্যলাভ করিবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেই হেতু সরকারকে সাক্ষাৎভাবে এ কাজে নামিতে আমি কোনমতেই পরামর্শ দিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা যখন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া দশ-এগারো বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই বাড়ি হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহারা বয়স্থা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিতে কিরূপে সম্মতি দিবে, তাহা

* Letter from Ishwarchandra Sharma to Baboos Keshub Chunder Sen, M. M. Ghose and Dwijendra Nath Tagore, dated 3 Decr. 1866.—See Mitra's *Vidyasagar*, pp. 191-92.

সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়া অনাথা বিধবাদেরই এ-কার্য্যে পাওয়া যাইতে পারে। নৈতিক দিক দিয়া শিক্ষাকার্য্যে তাহারা কতদুর উপযুক্ত হইবে, সে বিচার করিতেছি না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অন্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবে; ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

"সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত ভারত-গভর্ন্মেণ্টের পত্রখানিতে এক প্রশস্ততর পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের মনোভাব বুঝিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—সাহায্যদান-প্রণালীর প্রবর্ত্তন। দেশের লোক মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে সরকার তাহাদের সাহায্যার্থ যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। যতদুর বুঝিতেছি, হিন্দু-সমাজের অধিকাশ লোকই এরূপ সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ করিবে না; তবুও যাহারা ইহারা সফলতায় অতিবিশ্বাসী, সত্যই যদি তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে, আশা করা যায়, তাহারাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সরকারী অর্থসাহায্যে এ-সম্বন্ধে ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

"আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা নাই। কিন্তু ভারত-সরকার যে বিধি প্রচার করিয়াছেন তদনুসারে তাহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকিবে না।

"মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কতটা অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয় তাহা আমি বিশেষ জানি,—একথা আপনাকে বলা বাহুল্য। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে

কার্য্যকর করিবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, সাফল্যের কোনোই নিশ্চয়তা নাই, এবং এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোনমতেই আমি এ ব্যাপারে পোষকতা করিতে পারি না।

"বীটন বিদ্যালয়ের জন্য যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই,—এ-বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। যে মানব-হিতৈষী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম সংযুক্ত, তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মফঃস্বলের বালিকা-বিদালয়গুলির পক্ষে আদর্শরূপে কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত এক সুব্যবস্থিত বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। হিন্দু-সমাজের উপর এই বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট। চারিপাশের জেলা-সমূহে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহা পথ প্রস্তুত করিয়াছে; তাই আমার বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহা সার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও সত্য, ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতির যথেষ্ট অবসর আছে। কার্য্যকারিতার হানি না করিয়াও, বিদ্যালয়ের খরচ অর্দ্ধেক কমাইতে পারা যায়।

স্বাস্থ্যলাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতেছি। বীটন বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন-সম্বন্ধে যদি আমার মতামত জানিতে চান, তাহা হইলে কলিকাতায় আপনার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে, ও সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারি।"

(১ অক্টোবর, ১৮৬৭)

কিন্তু বাংলা-সরকার মিস্ কার্পেণ্টারের কল্পিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। শীঘ্র ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও ঘটিল।

ছাত্রী-সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে এবং অন্যান্য নানা কারণে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বীটন-স্কুল-কমিটির মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, বিদ্যালয়ের এ অবস্থায় এক বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এই কারণে জুলাই মাসে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হইল। অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে লইয়া এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। অনুসন্ধানের ফল সাব-কমিটি একটি রিপোর্টে দাখিল করিলেন (২৪ সেপ্টেম্বর)। রিপোর্ট-পাঠে বীটন-স্কুল-কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, যতদিন মিস্ পিগট্ অধ্যক্ষ থাকিবেন, ততদিন বিদ্যালয়ের উন্নতির আশা নাই। কমিটি এ-বিষয়ে বাংলা-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাংলা-সরকার মিস্ পিগট্‌কে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ হইতে সত্বর অপসারিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বীটন-স্কুল-কমিটিকে লিখিলেন :—

"ছোটলাটের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কমিটি যেন অপর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত না করেন। স্বর্গীয় বীটন তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য বাড়িখানি দান করিয়া গিয়াছেন। রাজস্ব হইতেও বছরে বছরে বেশ মোটা টাকা সাহায্যার্থ দেওয়া হয়। ছোটলাট মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ করা হইতেছে, এই-সকল দানের এতদপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলটি একটু ছোট করিয়া, তাহার সহিত শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নর্ম্মাল স্কুল যোগ করিয়া দিলে, ছোটলাটের বিশ্বাস, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

"এইরূপ করাই যদি শেষে সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে শিক্ষা-বিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে লইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। একজন ইংরেজের সভাপতিত্বে কমিটির দেশীয় সদস্যেরা এতদিন পর্য্যন্ত বীটন বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই ভদ্র মহোদয়েরা বিভাগীয় স্কুল-ইন্‌স্পেক্টারের সহযোগিতায় পরামর্শ-সভার সভ্যরূপে কাজ করিতে রাজী আছেন্ কি না, ছোটলাট জানিতে চান।" (৩রা মার্চ্চ, ১৮৬৮)।*

বীটন-স্কুল-কমিটি এই সর্ত্তে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। †

ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কার্য্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজন-সাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্ম্মাল স্কুল ও বীটন স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্য মিসেস্ ব্রিট্‌শে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। বীটন-স্কুল-কমিটি ভাঙিয়া গেল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ কমিটির সদস্যদের—বিশেষভাবে কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে—তাঁহাদের অতীত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

বিদ্যাসাগর এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। ১৮৬৯, ২রা মার্চ্চ স্কুল-ইনস্পেক্টার উড্রো সাহেব ডিরেক্টরকে লিখিতেছেন,—

---

* *Education Con. March, 1868*, No. A 9.
† *Ibid., July 1868*, Nos. A 68-70.

"বীটন স্কুল সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩এ [ফেব্রুয়ারি] আমার হাতে দিয়াছেন। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত বিদ্যালয়-গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং ইহা হিন্দু-মহিলাদের থাকিবার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি কি দরকার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

"যতদিন কলিকাতায় থাকিবে, ততদিন নর্ম্মাল স্কুলটি যে বিশেষ ফললাভ করিবে, এমন আশা তিনি করেন না। কিন্তু তবুও নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।"

বিদ্যাসাগরের কথাই ফলিল। তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পরবর্ত্তী ছোটলাট স্যর জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বীটন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নর্ম্মাল স্কুলটি তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানকে সফল করিতে গেলে দেশের রীতি ও সংস্কার অনুসারে যে উহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে, এ-বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল।* ডিরেক্টরের নিকট নিম্নলিখিত আদেশ-পত্র প্রেরিত হইল :—

"সাধারণভাবে সমস্ত বিষয়টি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায়, তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলটিকে সফল করিতে পারা যায় নাই। এ-সব বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই-সব মহিলার সহিত ছোটলাট প্রায় একমত। তাঁহাদের মত এই, নারীদের ধর্ম্মসংশ্রবহীন শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ

* "মিস্ কার্পেণ্টারের অর্থে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।...মিস্ কার্পেণ্টার ইহার পরিচালনে তাঁহার দেওয়া টাকা ব্যয় করিতে দিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহারই বিশেষ আপত্তিতে বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই স্কুল উঠাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন।"—D. P. I. to Bengal Govt., dated 27 Decr. 1871. *Ed. Con. Jany. 1872*, Nos. A 30-36.

স্বাধীনতা দেওয়া বড়ই বিপদজনক। অতএব ১৮৭২, ৩১এ জানুয়ারি তারিখের পর ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক।" *

উপরের লেখা হইতে বুঝা যাইবে, বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কি উৎসাহ ও আগ্রহই না ছিল। ১৮৯১, জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে, এক হিন্দু মহিলা-সঙ্ঘ বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করেন :—

"বীটন বিদ্যালয়ের কমিটি জানাইতেছেন, কলিকাতাস্থ মহিলা-অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-স্মৃতিরক্ষা-কমিটির সম্পাদকের নিকট হইতে ১৬৭০৲ টাকা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কোনো হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইলে, পরবর্ত্তী দুই বৎসরের জন্য এই টাকার আয় হইতে তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে।"

* *Education Con. April 1872*, Nos. A 54-58.

পরিশিষ্ট

বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় *

	গ্রাম	প্রতিষ্ঠার তারিখ	মাসিক খরচ
হুগলী :—	পোটবা	২৪ নভেম্বর, ১৮৫৭	২৯৲
	দাসপুর	২৬ ,,	২০৲
	বঁইচি	১ ডিসেম্বর	৩২৲
	দিগশুই	৭ ,,	৩২৲
	তালাণ্ডু	৭ ,,	২০৲
	হাতিনা	১৫ ,,	২০৲
	হয়েরা	১৫ ,,	২০৲
	নপাড়া	৩০ জানুয়ারি, ১৮৫৮	১৬৲
	উদয়রাজপুর	২[illegible]র্চ	২৫৲
	রামজীবনপুর	১৬ ,,	২৫৲
	আকাবপুর	২৮ ,,	২৫৲
	শিয়াখালা	১ এপ্রিল	২০৲
	মাহেশ	১ ,,	২৫৲
	বীরসিংহ	১ ,,	২০৲
	গোয়ালসারা	৪ ,,	২৫৲
	দণ্ডীপুর	৫ ,,	২৫৲
	দেপুর	১ মে	২৫৲
	রাউজাপুর	১ ,,	২৫৲
	মলয়পুর	১২ ,,	২৫৲
	বিষ্ণুদাসপুর	১৫ ,,	২০৲

* *Education Con.* [illegible] *Aug.* [illegible] *24 June 1858*, Nos. 167 A & B, H-I-K-L ; *Ed. Con. 2 Decr. 1858*, No. 5.

বর্দ্ধমান ঃ—	রানাপাড়া	১ ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০৲
	জামুই	২৫ জানুয়ারি, ১৮৫৮	৩০৲
	শ্রীকৃষ্ণপুর	২৬ ,,	২৫৲
	রাজারামপুর	২৬ ,,	২৫৲
	জোৎ-শ্রীরামপুর	২৭ ,,	২৫৲
	দাঁইহাট	১ মার্চ্চ	২০৲
	কাশীপুর	১ ,,	২১৲
	সাম্নুই	১৫ এপ্রিল	২৫৲
	রসুলপুর	২৬ ,,	৩১৲
	বস্তীর	২৭ ,,	২০৲
	বেলগাছি	১ মে	২০৲
মেদিনীপুর ঃ—	ভাঙ্গাবন্ধ	১ জানুয়ারি, ১৮৫৮	৩০৲
	বদনগঞ্জ	১০ মে	৩১৲
	শান্তিপুর	১৫ ,,	২০৲
নদীয়া ঃ—	নদীয়া	১ মে	২৮৲
			৮৪৫৲

সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ

শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে বিদ্যাসাগর অসাধারণ উৎসাহ এবং বিচক্ষণতার সহিত তাঁহার কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সংস্কৃত-শিক্ষার সংস্কার, বাংলা-শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার বহুল বিস্তার তাঁহার কাজ। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা বিষয়ে উপরিওয়ালারা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল, প্র্যাট সাহেব ছুটি লইয়া বিলাতাযাত্রা করায় দক্ষিণ-বাংলার ইন্‌স্পেক্টার অফ স্কুলের শূন্যপদে বিদ্যাসাগরই নিযুক্ত হইবেন। বস্তুতঃ ছোটলাট হ্যালিডের সহিত পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত পত্রাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

"গত শনিবার যখন আপনার সহিত দেখা করিয়া দক্ষিণ-বাংলার ইন্‌স্পেক্টার নিয়োগ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে একখানি লিখিত পত্র দাখিল করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি বিনীতভাবে প্রস্তাব করিতেছি,—যদি আপনি আমাকে ঐ পদে বাহাল করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজে আমার পদে যাঁহাকে আনা হইবে, তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে আমার সহিত যেন পরামর্শ করা হয়, কেন-না যে-সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে নির্ব্বাচন হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই, আমার মনে হয়, কে ঐ পদের উপযুক্ত সে সম্বন্ধে আমিই ঠিক কথা বলিতে পারিব। আর সরকারী ইংরেজী কলেজ ও স্কুল থাকার দরুণ বিভাগটি আমার

হাতে দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অন্ততঃ যে-জেলায় মডেল স্কুল আছে—যেমন মেদিনীপুর বর্দ্ধমান নদীয়া, সেই জেলাগুলি যেন আমার হাতে দেওয়া হয় ; কলেজ ও স্কুলগুলি বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টারের অধীন থাকিলে আর কোনো অসুবিধা হইবে না।" (মে, ১৮৫৭)

এই চিঠি হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই হ্যালিডে এপ্রিল মাসে লজ সাহেবকে ঐ শূন্যপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহাতে একান্ত নিরাশ হইলেন। তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হয় নাই, তাঁহার পদোন্নতির ন্যায্য দাবি বার-বার উপেক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। শিক্ষা-বিভাগের নূতন ডিরেক্টর—গর্ডন ইয়ং নামক এক অনভিজ্ঞ যুবক সিভিলিয়ান তাঁহার কাজে উৎসাহের পরিবর্ত্তে নানা বাধা দিয়া আসিতেছেন, এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য ছোটলাট হ্যালিডের মধ্যস্থতায় বিবাদের কতকগুলি কারণ দূরীকৃত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কাজে তাঁহার যে পদোন্নতি হইয়াছে, একজন কালা কর্ম্মচারীর পক্ষে তাহার অধিক আশা করা বিড়ম্বনা,—বিদ্যাসাগরের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিল। তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবিলম্বে অবসর লইবেন স্থির করিলেন, এবং ডিরেক্টরকে জানাইলেন,—

"আপনি তিন মাসের জন্য শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিয়া আমি মনে করিলাম, সরকারী কর্ম্ম হইতে শীঘ্র অবসর গ্রহণ করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা আপনাকে জ্ঞাত করাইবার ইহাই প্রকৃত সুযোগ। এই সঙ্কল্পের মূলে যে-সকল কারণ আছে তাহা ব্যক্তিগত — সাধারণের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সেগুলি বিবৃত করিতে বিরত হইলাম।" (২৯ আগষ্ট, ১৮৫৭)

হ্যালিডেও যাহাতে এই সংবাদ জানিতে পারেন, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর তাঁহাকেও এই পত্রের এক প্রতিলিপি পাঠাইলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্কল্পের কথা পাঠ করিয়া হ্যালিডে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লিখিলেন,—

"প্রিয় পণ্ডিত, তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি সত্যসত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বৃহস্পতিবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে এবং জানাইবে কেন তুমি এ সঙ্কল্প করিয়াছ।" (৩১ আগষ্ট)

দক্ষ কর্ম্মচারীরা কাজ ছাড়িয়া দেয়, ইহা হ্যালিডের কাছে কখনই রুচিকর ছিল না। তিনি পণ্ডিতকে হঠাৎ কিছু না-করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগরও সম্মত হইলেন। যদিও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তবুও তিনি আর এক বৎসর ঐ পদে কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাঙিতে শুরু হওয়ায় তিনি ১৮৫৮, ৫ই আগষ্ট তারিখে ডিরেক্টরের কাছে কর্ম্মত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন,—

"সরকারী কর্ত্তব্যপালনে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে যে বাংলার ছোটলাট বাহাদুরের নিকট আমার পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইলাম।

"আমি মনে করি, আমার কর্ত্তব্যপালনে যে অবিশ্রান্ত মনোযোগের প্রয়োজন, তাহা আমি আর দিতে পারিব না। আমার বিশ্রামের দরকার। সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে সরকারী কাজ হইতে অবসরগ্রহণ করিলে সেই বিশ্রাম পাইতে পারি।

"যে মুহূর্ত্তে স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইব, আমার ইচ্ছা তন্মুহূর্ত্ত হইতে আমার সময় এবং চেষ্টা প্রয়োজনীয় বাংলা পুস্তক প্রণয়নে এবং সঙ্কলনে নিয়োগ করিব। স্বদেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মের সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে

সত্য, তবুও আমার অবশিষ্ট জীবন এই মহৎ এবং পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ব্যয়িত হইবে। এ-বিষয়ে আমার গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ কেবল আমার জীবনের সহিত অবসানলাভ করিতে পারে।

"এরূপ গুরুতর পন্থা অবলম্বন করিবার গৌণ হেতুগুলির মধ্যে দুইটি এই,—ভবিষ্যৎ উন্নতির আর কোনো আশা নাই; এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের পক্ষে যে-সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত আমার সেই ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব।

"প্রথম কারণটির সম্পর্কে কথা এই,—বর্ত্তমান পদের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ অল্প শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। অস্বীকার করিতে পারি না, যে-ব্যক্তি এতদিন পর্য্যন্ত আপন পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ ভাবা অন্যায় নহে। এই পরিশ্রমসাধ্য গুরুকর্ত্তব্যের সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বিলম্ব করিলে ভগ্নস্বাস্থ্যবশে সেরূপ সংস্থান করাও আর চলিবে না।

"দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য,—আমি মনে করি সরকারের স্কন্ধে আমার মতামত চাপাইবার অধিকার নাই। তবুও, কর্ম্মের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ নাই—যাঁহাদের চাকরি করি তাঁহাদের নিকট হইতে এ সত্য গোপন করিতে চাই না। এ কারণে আমার কর্ম্মকুশলতার অবশ্য হানি হইবে। বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কাজ করা এক প্রধান গুণ। এইরূপ সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা অপেক্ষা অল্পও বলিতে পারি না,—অধিক বলিতেও ইচ্ছুক নই।"

"আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুযায়ী যতদূর সম্ভব উৎসাহসহকারে কর্ত্তব্যপালন করিয়াছি, এই তৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি।

আশা করি, সরকার চিরদিন আমার প্রতি যে অবিচলিত অনুগ্রহ, বিবেচনা এবং স্নেহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন তজ্জন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।"

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ-পত্র অনুমোদন করিয়া, মঞ্জুরীর জন্য সরকারের কাছে পাঠাইলেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ব্যাপারে ডিরেক্টরের সহিত বিরোধের ফলেই বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। কিন্তু হ্যালিডেকে লিখিত বিদ্যাসাগরের একখানি আধা-সরকারী পত্রে প্রকৃত কারণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর লিখিতেছেন,—

"বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম আমার পদত্যাগ-পত্রের যে-অংশগুলি আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকিয়াছে, সঙ্গতি বা ঔচিত্যের দিক দিয়া সে-অংশগুলি আমি উঠাইয়া লইতে পারি না। শারীরিক অসুস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেকধর্ম্মানুসারে বলিতে গেলে ইহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়া আমি স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী চাকরি করা যে আমার পক্ষে অনেক সময় অপ্রীতিকর এবং অসুবিধাজনক বোধ হইয়াছে, এবং যে-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, তাহাতে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে মাত্র—এ-সব কথা আপনাকে বহুবার বলিয়াছি। আপনি জানেন, আমি অনেক সময় কাজে বাধা পাইয়াছি। এ ছাড়া, দেখিয়াছি পদোন্নতির আর কোনো আশা নাই, কারণ আমার ন্যায্য দাবি একাধিকবার উপেক্ষিত হইয়াছে।

অতএব আমি আশা করি, আপনি স্বীকার করিবেন, আমার অভিযোগের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।" (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮)

ডিরেক্টরের অনুমোদন গ্রাহ্য করিয়া বাংলা-সরকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—

"পণ্ডিত মহাশয় যে কিঞ্চিৎ অসুস্থভাবে অবসর গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন ইহা দুঃখের বিষয়,—বিশেষতঃ তাঁহার যখন অসন্তোষের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যাহা হউক, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইবেন যে দেশবাসীর শিক্ষা-বিস্তারকল্পে তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য সরকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।" (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮)

স্বাস্থ্যের অবনতি কর্ম্মত্যাগের একটি কারণ বটে, কিন্তু পদোন্নতি সম্পর্কে আশাভঙ্গ এবং উপরিতন কর্ম্মচারীর সহিত মতবিরোধই যে বিদ্যাসাগরকে সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল তাহা উপরের চিঠিগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ছোটলাট হ্যালিডে তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত সদয় ও ভদ্রব্যবহার করিতেন সত্য, কিন্তু যাঁহার অধীনতায় পণ্ডিতকে প্রতিদিন কাজ করিতে হইত, সেই সাক্ষাৎ উপরিতন কর্ম্মচারী—শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের প্রতিবন্ধকাচরণ এবং অনাত্মীয় ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের পক্ষে আর কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং 'পণ্ডিত কিঞ্চিত অসুস্থভাবে অবসর গ্রহণ করিলেন' বাংলা-সরকারের এই মন্তব্য অযথার্থ। বিদ্যাসাগরের চাকরির কাল দশ বৎসরের অধিক নহে; এত অল্পদিনের সরকারী কাজে আংশিক পেন্‌সনেরও অধিকারী হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত কর্ম্মের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে এককালীন কিছু টাকা দান করিলেই সরকারের পক্ষে শোভন হইত।

১৮৫৮, ৪ঠা নভেম্বর ই. বি. কাওয়েল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই বিদ্যাসাগর বোর্ড অফ একজামিনার্স-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন (মে, ১৮৬০)। ইহার কারণ তিনি ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে বিবৃত করিয়াছিলেন।

সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা

বিদ্যাসাগর এখন আর সরকারের বেতনভোগী কর্ম্মচারী ন'ন। না হইলেও, বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি সরকারের উপকার সাধন করিতে লাগিলেন। পর পর বহু ছোটলাটই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

সংস্কৃত কলেজ

বিদ্যাসাগরের অবসরগ্রহণের অল্পদিন পরেই শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সংক্রান্ত এক প্রস্তাব এবং উড্রো, রোয়ার ও সংস্কৃত কলেজের নূতন অধ্যক্ষ—কাওয়েল সাহেবের তদ্বিষয়ক মন্তব্যগুলি বাংলা-সরকারের কাছে পেশ করিলেন। ডিরেক্টরের মত এই, সংস্কৃত কলেজ এক অতিপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও বর্ত্তমান যুগের কিছু পিছনে পড়িয়া আছে, আরও উন্নতির দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার সহিত অধিকতর পরিমাণে সুসঙ্গত করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে স্কুল এবং কলেজ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত। স্কুলে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ানো হইবে এবং কলেজের আণ্ডার-গ্রাডুয়েট ছাত্রগণ সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অল্প মাহিনায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অন্যান্য বিষয়ের লেকচার শুনিতে পাইবে।

বিদ্যাসাগর কিছুদিন পূর্ব্বেই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ছোটলাট তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। উত্তরে পণ্ডিত লিখিলেন,—

"কাওয়েল, রোয়ার এবং উড্রো সাহেব লিখিত সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত তিনটি বিবরণী আমি যত্ন ও মনোযোগসহকারে পড়িয়াছি।...কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের

বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মৃতি সম্বন্ধে যে-সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত আছে, সেগুলির সাহায্যে শুধু উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী আইন শেখানো হয়। এই সকল জিনিষ অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন, অতএব এ-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। এই দুইটি বিষয় এখন যে-ভাবে শেখানো হয় তাহাতে ধর্ম্মগত কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার বিনীত মত এই, এ-সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।......

"ডাঃ রোয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন, কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হোক এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারী ইংরেজী স্কুল ও কলেজ সমূহে সংস্কৃত-চর্চা চালাইবার জন্য ব্যয়িত হোক। স্কুল-কলেজে সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচলনের আমি যতটা পক্ষপাতী, ততটা আর কেহ নয়। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের বিলোপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আমার অপেক্ষা অধিকতর বিরোধীও কেহ নাই। কাওয়েল সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, সংস্কৃত যদি শিখিতেই হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করা ভাল। ইংরেজী স্কুল-কলেজে ইহা উপযুক্তরূপে শিক্ষা করা যায় কি না সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে, বিশেষ যখন ঐ বিদ্যালয়গুলিতে ভালরূপে বাংলা শিখাইবার চেষ্টাও সফল হয় নাই। ডাঃ রোয়ারের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিলে, যে-ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণরূপে রক্ষা করাই সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মুখ্য উদ্দেশ্য

ছিল, সেই ভাষা ও সাহিত্য ভারতবর্ষের এই অংশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।" (১৭ই এপ্রিল, ১৮৫৯)

বাংলা-সরকার ডিরেক্টরের সঙ্গে একমত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবটি বড়লাটের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাইলেন (২৫ এপ্রিল)। বড়লাটও একটি বিষয় ছাড়া সকলই মঞ্জুর করিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মৃতি-অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়াতে, পাঠ্যতালিকা হইতে ইহা বাদ দিবার প্রস্তাব ছোটলাটকে পুনর্বিবেচনা করিতে বলা হইল। *

ছোটলাট ক্যাম্পবেলের সময়ে সংস্কৃত কলেজের নূতন ব্যবস্থা হইল। তাঁহার নীতিই ছিল সকল বিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করা। ১৮৭১, ৩০ মে বাংলা-সরকার ডিরেক্টরের উপর আদেশ জারি করিলেন, যেন সুযোগ পাইলেই কলেজের নির্দ্দিষ্ট ব্যয় সংক্ষেপ করা হয়। স্মৃতির অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি অবসরগ্রহণ করিতেই ডিরেক্টর প্রস্তাব করিলেন ঐ পদটি উঠাইয়া দেওয়া হোক (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২)। সংস্কৃত কলেজের উচ্চতম ইংরেজী-বিভাগও উঠাইয়া দিবার আদেশ হইল। ঠিক হইল, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত ছাড়া সব বিষয়ই পড়িবে।

কিন্তু স্মৃতির অধ্যাপনা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এই আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন করিলেন। ছোটলাট আবার বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাহিলেন। তিনি লিখিলেন, যে-সকল দেশীয় ভদ্রলোক সংস্কৃত-শিক্ষায়

---

* *Home Dept. Education Cons. 20 May 1859*, Nos. 16-18.

আগ্রহশীল, বিদ্যাসাগর যদি তাঁহাদের মতামত জানিয়া এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। *

তদনুসারে বিদ্যাসাগর ছোটলাটের সহিত দেখা করিলেন। বিদ্যাসাগর জানাইলেন, তাঁহার অভিমত স্মৃতির জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপকের পদ থাকা দরকার। ছোটলাট এরূপ আশা করেন নাই। যাহা হউক, পরিশেষে তিনি আদেশ জানাইলেন, দর্শন ও অলঙ্কারের সহিত স্মৃতির অধ্যাপকের পদ এক হইয়া যাইবে। কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের প্রতি বাংলা-সরকারের আদেশের মর্ম্ম এই :—

"......ছোটলাট এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের গোড়াতেই জানাইয়াছিলেন, হিন্দুসমাজের বহু ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুসারে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ আলাপে এবং অন্যরূপেও এ-বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত দুই ভদ্রলোক এবং অপরাপর যোগ্য ব্যক্তির প্রস্তাব এতই পরিমিত ও সঙ্গত বলিয়া মনে করেন যে তিনি মূলতঃ তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইতে পারিয়া আনন্দিত হইতেছেন...। (১৭ মে, ১৮৭২) †

উপরিলিখিত পত্রখানি যে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহাতে হিন্দুরা ভাবিলেন, বিদ্যাসাগর স্মৃতির অধ্যাপক পদের ব্যবস্থা

* H. L. Johnson, Private Secretary, to Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, dated Belvedere, the 22nd April, 1872.—*Education Con. July 1872*, Nos. A. 27-29.

† *Education Con. June 1872*, Nos. A. 16-28. পত্রখানি ১৮৭২, ২২এ মে তারিখের কলিকাতা গেজেটেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

সম্বন্ধে ছোটলাটের মতে সায় দিয়াছেন। এজন্য বিদ্যাসাগরকে দেশবাসীর নিকট হইতে বহু গালাগালি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি ছোটলাটকে এই পত্র লিখিলেন,—

"সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচারে যাঁহারা আগ্রহশীল, হিন্দুসমাজের এমন-সব প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিতে আমাকে বলা হইয়াছিল। লোকের এইরূপ ধারণা জন্মিতে পারে যে প্রস্তাবগুলি আমার নিকট হইতে আসিয়াছে। সেজন্য আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি যে, স্মৃতি-অধ্যাপনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব আমার নিকট হইতে আসে নাই। বস্তুতঃ আমি আপনাকে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলাম, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে স্মৃতির একজন স্বতন্ত্র অধ্যাপক দরকার; এখনও আমার সেই মত। আপনি জানেন, স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়-বস্তু বিপুল, সারাজীবনের চেষ্টায় ইহা শিখিতে হয়। একথা সত্য, এমন কেহ কেহ আছেন, সংস্কৃত-সাহিত্যে যাঁহাদের জ্ঞান গভীর এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও যাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়; কিন্তু এইরূপ বহুমুখী জ্ঞান অল্পই দেখা যায়। অন্য বিষয়ের অধ্যাপক পদের সহিত স্মৃতির পদ এক করিয়া ফেলিলে এই বিষয়টিকে খাটো করা হইবে এবং ইহার কার্য্যকারিতাও কমিয়া যাইবে, কেন-না যে-অধ্যাপক অবসর-মত ইহা পড়াইবেন তিনি বিষয়ের বিপুলতা অনুসারে ইহাতে যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার তাহা দিতে পারিবেন না। আমি সরকারী পত্রে দেখিয়াছি, কলেজের অধ্যক্ষের মতে 'অপরাপর কাজ করিয়াও অধ্যাপক মহাশয় এখন অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন।' ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের কাজে যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমি এই মত সমর্থন করিতে পারি না। যিনি কলেজে আইন পড়িয়াছেন মাত্র, কিন্তু শুধু আইনই যাঁহার গভীর অধ্যয়নের

বিষয় নয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্য দর্শন অথবা গণিতের এমন-কোনো অধ্যাপককে আপনি যদি তাঁহার অন্যান্য কাজের সঙ্গে তাঁহাকে আইন পড়াইতে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহার যে ফল হয়, তাহা বিবেচনা করিলে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটির গোলযোগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন। আইন-ব্যবসায়ীরা যে এই পদ্ধতি সমর্থন করিবেন না সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, অথচ সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ বন্দোবস্তের প্রস্তাবই করা হইয়াছে। পণ্ডিত মহেশচন্দ্রের গুণ এবং পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করি, কিন্তু আমার ভয় হয়, এতগুলি কাজের ভার একসঙ্গে তাঁহাকে দিলে শুধু স্মৃতির অধ্যাপনা কেন, যে-বিষয়গুলি পড়াইতে তিনি বিশেষরূপে উপযুক্ত সেইগুলির অধ্যাপনাতেও ত্রুটি হইবে। আপনি বলিয়াছেন, 'স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা হইবে, এই ইচ্ছা আছে এবং বরাবরই ছিল।' কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আপনার ইচ্ছা সুসিদ্ধ হইবে না। অতএব আপনার আদেশের এই অংশটি পুনর্বিবেচনা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। এই অধ্যাপক পদ তুলিয়া দেওয়াতে মাসে একশত টাকা মাত্র ব্যয়সঙ্কোচ হইবে, এই টাকা এতই অল্প যে আমি একান্তভাবে আশা করি, হিন্দুসমাজের কথা ভাবিয়া আপনি এ-বিষয়ে এই সুবিধাটুকু করিয়া দিবেন।...

"স্মৃতির অধ্যাপক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থার পরামর্শ আপনাকে আমি দিয়াছি—সরকারী পত্রের লিখনরীতি হইতে ইহা অনুমিত হইতে পারে। এ-সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের আগ্রহ এত বেশী যে তজ্জন্য লোকে আমাকে ভুল বুঝিতে পারে। এই কারণে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের প্রস্তাব

সম্পর্কে অতি অনির্দ্দিষ্টভাবে আমার নামের উল্লেখে সাধারণের মনে যে ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মিতে পারে, তাহা অপনীত করিলে আমার প্রতি সুবিচার করা হইবে।" (২৩ মে, ১৮৭২)

বিদ্যাসাগরের পত্রে কোনোই ফল হয় নাই। তবে এই ব্যাপারে ছোটলাট তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত চিঠিপত্র ১০ই জুন তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণের মন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা অপসারিত করিয়াছিলেন।

গণশিক্ষা

জনসাধারণের জন্য অল্প খরচার বিদ্যালয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায় সেই বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বাংলা-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিসাধনের উপায় সম্বন্ধে ভারত-সরকার বাংলার ছোটলাট গ্র্যাণ্ট সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ছোটলাট শুধু শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীদের নহে, গ্রাম্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে অথবা কৃষকের কল্যাণসাধনে যাঁহারা সচেষ্ট এরূপ কয়েকজন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের বক্তব্য জানিতে চাহিলেন। ইহার মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন। বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে ছোটলাটকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"...সরকার যে ভাবিয়াছেন বিদ্যালয়-পিছু মাসিক পাঁচ-সাত টাকা মাত্র ব্যয় করিয়া কোনো শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিবেন, আমার মতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কার্য্যকর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। পাঠ, লিখন এবং কিঞ্চিৎ গণিত শিখাইতে যাঁহারা কোনরূপে সমর্থ, নিজ নিজ গ্রামের প্রতি আকর্ষণ যতই থাক এমন যৎসামান্য বেতনে তাঁহাদিগকে কার্য্যগ্রহণে প্রবৃত্ত করিতে পারা যাইবে না।...

"উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকাবন্দি বিদ্যালয়গুলিতে যে-প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে তাহার সঠিক খবর আমি জানি না। বিহারের বিদ্যালয়-গুলিতেও ঐ একই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে ধরিয়া লইলেও আমি বলিব বাংলার পাঠশালাগুলিতে যে ব্যবস্থা আছে ইহা অনেকাংশে তদনুরূপ। যতটা বুঝিতেছি, বিহারের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষণীয় বিষয়ের সীমা হইতেছে পত্রলিখন, জমিদারী হিসাব ও দোকানের খাতাপত্র রাখা পর্য্যন্ত। বিহারের এবং বাংলার পাঠশালাগুলির মধ্যে প্রভেদ এই যে, কিছু উন্নত ধরণের কয়েকখানি ছাপা বই বিহারে নামমাত্র ব্যবহৃত হয়। বাংলা দেশে এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচার যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে গুরুমহাশয়দের অল্পকিছু মাসিক বেতনের ব্যবস্থা, তাঁহাদের পাঠশালাগুলিতে খানকয়েক মুদ্রিত পুস্তকের প্রবর্ত্তন এবং সেগুলি সরকারী পরিদর্শনের অধীন করিলে সহজেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য, এরূপ শিক্ষা নগণ্য হইলেও জনসাধারণের মধ্যে (যদি জনসাধারণ কথার অর্থে শ্রমিক-শ্রেণী বুঝিতে হয়) বিস্তৃত হইবে না। কেন-না, এখন পর্য্যন্ত বিহারে বা বাংলায় এই শ্রেণী হইতে অতি অল্পসংখ্যক বালকই পাঠশালায় শিক্ষার্থী হয়।

"শ্রমিক-শ্রেণীর অবস্থার উপরই ইহার কারণ আরোপিত করা যায়। সাধারণতঃ অবস্থা এতই খারাপ যে ছেলেদের শিক্ষার দরুণ তাহারা কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ। একটু বড় হইলেই যখন কোনরূপ কাজ করিয়া যৎসামান্য কিছু উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত হয়, তখন আর তাহারা ছেলেদের পাঠশালায় রাখিতে পারে না। তাহারা ভাবে—এবং সম্ভবতঃ এ ভাবনা যথার্থ—যে ছেলেদের কিছু লেখাপড়া শিখাইলেই তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না, তাই ছেলেদের পাঠশালায় পাঠাইতে তাহাদের কোনরূপ প্রবৃত্তি

থাকে না। তাহারা যে কেবল জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইবে, এ আশা করিতে পারা যায় না,—বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই যখন শিক্ষার সুফলের কথা এখনও প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শ্রমিক-শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থার চেষ্টায় কোনো কাজ হইবে না। যদি এ-বিষয়ে পরীক্ষা করা সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সরকার যেন অবৈতনিকভাবে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত থাকেন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, এরূপ পরীক্ষা ব্যক্তিগত এবং বে-সরকারীভাবে করা হইয়াছে, কিন্তু সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই।

"বিলাতে এবং এদেশে এমনি একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট ও মিনিটগুলি অত্যন্ত অনুকূল ভাবের হওয়ায় বোঝা যাইতেছে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পাইবে।

"একমাত্র কার্য্যকর উপায় না হইলেও বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায়-স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-বিস্তার-কার্য্যে নিজেকে বদ্ধ রাখিবেন। একশত বালককে লিখন-পঠন এবং কিছু অঙ্ক শেখানো অপেক্ষা একটিমাত্র ছেলেকে উপযুক্ত-রূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা-প্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন। সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোনো রাজসরকার এরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারে কিনা সন্দেহ। বলা যাইতে পারে, বিলাতে সভ্যতার অবস্থা অতি উন্নত হইলেও, শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের অবস্থা তাহাদের

এদেশের ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা কোন-প্রকারে ভাল নয়।" (২৯এ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯) *

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন

১৮৫৪, ১১ই নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অ্যাক্ট ২৬ পাস হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য—'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে নাবালক জমিদারগণের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা।' সাক্ষাৎভাবে একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর পরিচালনায় ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের নাবালকদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৬, মার্চ মাসে কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন খোলা হয়। † ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক তিনশত টাকা বেতনে ইহার পরিচালক নিযুক্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে সরকার স্থানীয় চারিজন ভদ্রলোককে এই প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিলেন; তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে ইহা পরিদর্শন করিবেন এবং কোনরূপ উন্নতির প্রয়োজন বোধ করিলে সরকারের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। সরকারের নির্ব্বাচিত প্রথম চারিজন পরিদর্শক ছিলেন—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এবং বাবু রমানাথ ঠাকুর। প্রত্যেকেই বৎসরে তিন মাস করিয়া পরিদর্শন করিবেন স্থির হয়।

---

* *Education Dept. Procdgs. October 1860, No 53.*

† প্রথমে চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। ১৮৬৩, অক্টোবর মাসে ইহা মানিকতলা আপার সার্কুলার রোডে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

১৮৬৩ নভেম্বর হইতে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেন। এই পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা-স্বরূপ তিনি ১৮৬৪, ৪ এপ্রিল সরকারের নিকট এক বিবরণী পাঠাইলেন। ছাত্রদের শিক্ষা-বিষয়ে অধিকতর উন্নতি ও ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত কতকগুলি ব্যবস্থার প্রস্তাব ইহাতে ছিল। পর বৎসরের প্রারম্ভে তিনি আর একটি বিবরণী দাখিল করেন; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন পরিচালনার্থ নিয়মাবলীর ১১ সংখ্যক নিয়মের দিকে আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এই নিয়মে আছে 'কেবল অতি গুরু অপরাধেই শারীরিক শাস্তির বিধান হইবে।' অর্ডার-বুক হইতে দেখা যাইতেছে প্রায় প্রতি-মাসেই এক অথবা অধিক-সংখ্যক বালক চার হইতে বার ঘা পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত লাভ করিয়াছে। যে-সকল কারণে তাহারা এইরূপ শাস্তি পাইয়াছে, তাহা 'গুরু অপরাধের' পর্য্যায়ে পড়ে বলিয়া আমার মনে হয় না। একটিমাত্র ঘটনা সম্ভবতঃ ইহার ব্যতিক্রমস্থল, সেটিও আবার ভালরূপে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষায় দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই শাস্তি অনিষ্টকর পরিণামের জন্য সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই বর্জ্জিত হইয়াছে। বেত্র-ব্যবহার না করিয়াও সেই সকল প্রতিষ্ঠানে শত শত ছাত্র পরিচালিত হইতেছে। ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনে ইহার প্রয়োজন কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নাবালক জমিদারদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার মোটেই শোভন নয়। বালকদের শিক্ষাদান-কার্য্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক; ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না শোধরাইয়া বরং নষ্ট

হইয়া যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়।" (১১ই জানুয়ারি, ১৮৬৫)

ছাত্রদের পরবর্ত্তী ব্যবহারে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের সুনাম বাড়ে নাই। দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহে বলা হইতে লাগিল, পরিচালক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কুদৃষ্টান্ত নাবালক ছাত্রদের পক্ষে হিতকর নহে; লোকে তাঁহার নৈতিক চরিত্রের উপর প্রকাশ্যভাবে দোষ আরোপ করিতে লাগিল। ১৮৬২ সালের ২০এ ডিসেম্বর তাহেরপুরের জমিদার চন্দ্রশেখর রায় এবং রাজশাহী ও নিকটবর্ত্তী জেলার আরও ষাটজন জমিদার প্রতিষ্ঠানটির নানাবিধ ত্রুটি দেখাইয়া সরকারের নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রে প্রার্থনা জানানো হইল, স্ব স্ব জেলা-স্কুলে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বে নাবালকদিগকে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনে পাঠানো ঠিক হইবে না। ইহাতে তাহারা পারিবারিক প্রভাবের অধীনে থাকিবে, অল্পবয়সে তাহাদিগকে কলিকাতার নাগরিক প্রলোভনের মধ্যে পড়িতে হইবে না।

সরকার প্রথমে প্রতিষ্ঠানটিকে কলিকাতা হইতে মফঃস্বলের কোনো শহরে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের গঠন এবং পরিচালন প্রণালী সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৮৬৫)। সে কমিটির সদস্য হইলেন—অস্থায়ী ডি. পি. আই. উড্রো, বোর্ড অফ রেভেনিউ-এর জুনিয়ার সেক্রেটারি লেন, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই ব্যাপারে পণ্ডিত যে স্বতন্ত্র রিপোর্ট দেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

"ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের উদ্দেশ্য—নাবালক জমিদারদের যথোপযুক্ত শিক্ষা-দান করা এবং তাহাদিগকে সমাজের সুযোগ্য সভ্য এবং সৎ জমিদার রূপে গড়িয়া তোলা। কিন্তু এখানে তাহারা যে শিক্ষা

পায় তাহা শিক্ষা-নামের অযোগ্য, এবং পল্লীসম্পর্কে প্রায় কিছুই না শিখিয়া, কেবল অল্পস্বল্প ইংরেজীর জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।...

"এখানে-শিক্ষিত কতকগুলি যুবকের পরবর্ত্তী নিন্দনীয় জীবন প্রতিষ্ঠানটির অখ্যাতির কারণ হইয়াছে। আমি মনে করি, ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন হইতে নিষ্ক্রান্ত ছাত্রদের সহিত অন্য তরুণ জমিদারের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে শেষোক্ত তরুণরাই ভাল।...

"এখন নাবালকত্বের বয়সের সীমা ১৮ বৎসর। ইহা বাড়াইয়া ২১ বৎসর করিলে, আমার বিবেচনায়, ছাত্রদের পক্ষে খুবই হিতকর হইবে, কেন-না সেক্ষেত্রে তাহারা নিজের উন্নতিসাধনের জন্য দীর্ঘতর অবসর পাইবে এবং এমন বয়সে বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে যখন মানুষের চরিত্র একরকম গঠিত হইয়া যায়।" (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫)।

শারীরিক শাস্তিবিধানের সম্বন্ধে উড্রো সাহেব রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। নাবালক জমিদারদের পক্ষে ইহার যে একান্ত প্রয়োজন এবং এতদ্ভিন্ন শৃঙ্খলারক্ষা যে অসম্ভব, পরিচালক রাজেন্দ্র-লালের এই মত লেন সাহেব সমর্থন করিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য, সরকারও এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর বিদ্যাসাগর আর অধিক দিন ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শক থাকেন নাই। তাঁহার পরিদর্শনের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ, ১৮৬৫। খুব সম্ভব, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত কোনো বিষয়ে মতভেদই তাঁহার পদত্যাগের কারণ। *

* বাংলা-গভর্ন্মেণ্টের রাজস্ব-বিভাগের দপ্তরে আমি ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন সংক্রান্ত বিদ্যাসাগরের তিনখানি রিপোর্ট দেখিয়াছি। সুবলচন্দ্র মিত্রের পুস্তকেও এগুলি মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে ভুল, এমন কি মূলের সহিত পার্থক্য আছে।

উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মত

সরকার পুনরায় বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্টস্ পরীক্ষাগুলিতে যে-সকল ভাবী পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তৎসম্পর্কে কলেজীয় এবং জেলা-স্কুলগুলির পাঠ্য-বিষয়ে কতদূর পর্য্যন্ত সংস্কৃত-চর্চ্চা প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার ও রিপোর্ট দিবার জন্য ১৮৬৩, আগষ্ট মাসে এক কমিটি গঠিত হয়। বিদ্যাসাগরকে এই কমিটির একজন সদস্য করা হয়। উড্রো সাহেব ইহার সভাপতি এবং কাওয়েল অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৮৭৩, ১১ই জুলাই শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন্ সাহেব ইংরেজী ও বাংলা স্কুলপাঠ্য পুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটির সভ্য হইবার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন। তাঁহার বিবেচনায় এ-বিষয়ে দেশীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই; তিনি লিখিলেন,—

“দুইটি কারণে আমি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে জড়িত। সেইহেতু আমার বিবেচনায় কমিটির আলোচনায় পক্ষগ্রহণ করা উচিত হইবে না। তা ছাড়া, আমি মনে করি আমার উপস্থিতি আমার গ্রন্থগুলির দোষগুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় হইবে।”

স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে

বিদ্যাসাগরের সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ দেশ ও দশের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর হইয়াছিল। তাঁহার একটা মোটা রকমের আয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না—তাঁহার স্বরচিত পুস্তক বিক্রয়ের আয়ই তখন মাসিক তিন-চার হাজার টাকা।* তিনি এইবার স্বাধীনভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইলেন।

মেট্রোপলিটান্ ইনষ্টিটিউশন

মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইহাই বাঙালীর নিজের চেষ্টায় নিজের অধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রথম কলেজ। মেট্রোপলিটানের নাম এখন বিদ্যাসাগর কলেজ হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার নাম মেট্রোপলিটান ছিল না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়া শঙ্কর ঘোষের লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারী স্কুল অপেক্ষা অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। মিশনরীদের স্কুলে মাহিনা কম ছিল বটে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইত বলিয়া হিন্দুরা সেখানে ছেলেদের পাঠাইতে চাহিত না। প্রথম কয়েক মাস প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা বিদ্যাসাগরকে ও তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

* ১৮৪৮-৪৯ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীও চালাইতে থাকেন। সংস্কৃত প্রেস হইতে মুদ্রিত সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ডিপজিটারীতে মজুত থাকিত। ব্যবসায়টি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল এবং বহু বৎসর ধরিয়া ইহা হইতে রীতিমত লাভ হইত।

স্কুল-পরিচালনে সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা স্বীকৃত হইলে এক পরিচালক সমিতি গঠিত হইল। ১৮৬১, মার্চ মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি এই সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। পরিচালকবর্গের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে এই বৎসরে দুইজন প্রতিষ্ঠাতা পদত্যাগ করিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

শিক্ষাপ্রচার এবং বিদ্যালয় পরিচালনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অসাধারণ। তা ছাড়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাধারণের কার্য্য করিতেন। ইহা বুঝিয়াই অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যাসাগর এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীলের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের ভার দিয়া অবসরগ্রহণ করিলেন। নূতন কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন। স্কুলের নানারূপ সংস্কারে হাত দিয়া বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সম্যকরূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের গোড়া হইতে বিদ্যালয়টির নূতন নাম হয়—হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনার গুণে ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ (১৮৬৬) এবং হরচন্দ্র ঘোষের (১৮৬৮) মৃত্যুতে এবং তৎপূর্ব্বে অপর তিনজন সদস্যের পদত্যাগে বিদ্যালয় পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগরের উপর পড়িল। ১৮৭২, জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালকে লইয়া তিনি এক কমিটি গঠন করিলেন এবং বিদ্যালয়ে যাহাতে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়া যায় তদ্বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিলেন। বি. এ. পড়াইবার অধিকার না পাইলেও ইহাতে ফার্ষ্ট

আর্টস্ পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করিলেন। ১৮৭৪ সালে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। দেশীয় লোকের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সাট্‌ক্লিফ সাহেব বলিয়াছিলেন,—"পণ্ডিত তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন!" ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ফার্ষ্ট গ্রেড কলেজে পরিণত হইল, এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ছাত্রেরা বি. এ. পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হইল। পরীক্ষার ফল ভালই হইল।

ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোনো কলেজ যে ভাল চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতী অধ্যাপকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারা অনুরূপ, এমন কি কোনো কোনো বিষয়ে উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। মেট্রোপলিটানের সাফল্য দেখিয়া অন্যান্য কলেজ হইতে অনেক ছাত্র এই কলেজে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-বিস্তারের এক নূতন দিক খুলিয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্ত্তক। তিনি যখন যে-কাজে হাত দিতেন, সে-কাজ সার্থক না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তা ছাড়া শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সারা বাংলার শিক্ষা-বিস্তারে যে-প্রতিভা নিযুক্ত ছিল, তাহা একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, সেই প্রতিষ্ঠান অতুলনীয় সফলতা লাভ করিল।

বিদ্যাসাগরের আর একটি বড় গুণ ছিল। তিনি পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন না, সকল কাজ নিজে দেখিতেন। তিনি অনেক সময় বিদ্যালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিতেন নিয়ম-মত কাজ চলিতেছে কি-না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশ ছিল, শিক্ষকেরা কখনও বালকদের উপর শারীরিক শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন না। তিনি বলিতেন, শান্ত সদয় ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহাকে সংশোধনের অতীত বলিয়া বোধ হইত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিতেন।

বাক্‌লাণ্ড সাহেব ভারত-সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

> "১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এক সুপরিচিত ঘটনা। এই ধরণের পরবর্ত্তী বহু বিদ্যালয়ের ইহা আদর্শস্থানীয়। মেট্রোপলিটান কলেজের সংশ্লিষ্ট স্কুলে আট শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত; এতদ্ব্যতীত কলিকাতাতেই এই বিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি শাখা বিদ্যমান ছিল।"

যে জমির উপর এখন কলেজটি অবস্থিত, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাহা কেনা হয়। সুবৃহৎ বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৮৮৭ সালের গোড়া হইতেই এখানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়।

গ্রন্থ-রচনা

বিদ্যাসাগর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দু-চারখানির কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুস্মৃতি বা

পাঠ্যপুস্তক। অবশ্য এ-কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে তখনকার দিনে এরূপ উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে বাংলা-গদ্যের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলি তাহার নিদর্শন। বিদ্যাসাগরের গদ্য কিঞ্চিৎ সংস্কৃতানুসারী হইলেও অতি সুললিত। বঙ্কিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্ব্বে সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।...

"এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার: প্রাপ্ত হইল। ইহাঁদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"*

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি অতুলনীয় প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

* "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী, ১২৯৯)

"তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানব-সভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়...তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।...

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা-গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।...বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।...

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্ব্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন্ প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন।...বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গলা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্ত্তন। এতদ্দ্বারা, যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।...

"বাঙ্গলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গলা-গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা-গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।

গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্য ভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা-গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।" *

বিদ্যাসাগরের রচনা কিরূপ আবেগময়ী, ওজস্বী ও প্রাঞ্জল ছিল তাহা 'বিধবাবিবাহ' পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হইবে :—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি আধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন একাধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর, দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্নপ্রকাশ ও অনাদর-প্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের

---

*"বিদ্যাসাগর চরিত"—সাধনা, ভাদ্র, ১৩০২, পৃ. ৩০৩-০৫।

অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এক কালে সকল ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়।...

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু, তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থাবিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না।...

"তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়। দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

"হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!"

যাঁহারা বাল্যকালে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কখনও ইহার ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। নিম্ন-উদ্ধৃত অংশের মত সীতার বনবাসের বহু স্থলই তাঁহাদের স্মৃতিপথে জাগরিত থাকিবে।—

"সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ, দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি, হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে, এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য, এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গবিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে, তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে, ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরী-তীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা, প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল!"

বিদ্যাসাগরের "প্রভাবতী সম্ভাষণ"ও একটি আবেগপূর্ণ রচনা। তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে ইহা রচিত।—

"বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ; কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই।...

"আমি, সর্ব্ব ক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও নিরতিশয় প্রীতিপদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি; কেবল, তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।...

"বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্ব্বাংশে উচিত ছিল। তুমি স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।...

"একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের,

এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য্য করিতেছিলে।...

"তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয়ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যন্ত্রনা-ভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও সচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

"কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে! অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, পিপাসায় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই।...

"তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যারপরনাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।...

"বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।" *

* সাহিত্য, ৩য় বর্ষ, বৈশাখ, ১২৯৯।

দয়া-দাক্ষিণ্য

দরিদ্র এবং আর্ত্তের সহায়, দয়ালু দাতা এবং জনহিতৈষী রূপে বিদ্যাসাগরের তুলনা নাই। এই মহদ্‌গুণের জন্য আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আজও তিনি দেশবাসীর নিকট "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" নামে পরিচিত। দুঃস্থ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে তাঁহার আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সাহায্যেই বহু দরিদ্র বিধবার সংসার চলিত। শত শত অনাথ বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হইত। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। শুধু বন্ধু এবং সহকর্ম্মীরাই নয় তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সাহস ছিল অতুলনীয় এবং দাক্ষিণ্য অপূর্ব্ব। অথচ তিনি নিজে নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন। এই তেজস্বী দানবীর সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বড় বড় জমিদারের মাথা আপনি নত হইয়া পড়িত। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর সিসিল বীডন এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাব্রতীর সহিত প্রায়ই পরামর্শ করিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন।

রাজ-সম্মান

অবসরগ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৮০ সালে নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত-গভর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিদানে বিদ্যাসাগর ন'ন সরকার নিজেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে (১৮৬৪, ৪ জুলাই) বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক

সোসাইটির অনারারি মেম্বর—সম্মানিত সভ্য—নির্ব্বাচিত হন। * এই উচ্চসম্মান লাভ এযাবৎকালের মধ্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পলের আমলে তাঁহাকে এই সম্মান-লিপি প্রদান করা হয়—

"বিধবা বিবাহ আন্দোলনের † নেতারূপে তাঁহার আন্তরিকতার এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের অগ্রগামী দলের নায়করূপে তাঁহার মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইহা প্রদত্ত হইল।" (১ জানুয়ারি, ১৮৭৭)।

মৃত্যু

তাঁহার শরীর পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। ক্রমেই তিনি বিশেষরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ-ব্যথা এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রোগভোগে দেহ সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া গেল। তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন। একে একে শ্রমসাধ্য সকল কার্য্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। নগরের কলকোলাহল তাঁহার আর সহ্য হইত না। তিনি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে লাগিলেন। কার্ম্মাটারের বাড়িতেই তিনি বেশী যাইতেন।

শরীর আর বহিল না। ১৮৯১, ২৯এ জুলাই পূর্ণ ৭০ বৎসর বয়সে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

* *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1865, p. 15.

† যাঁহারা বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি :—"A Collection containing the Proceedings which led to the passing of Act xv. of 1856." Compiled by Narayan Keshav Vaidya (Bombay, 1885). বইখানি আমি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীতে দেখি। সুবলচন্দ্র মিত্রের পুস্তকেও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিবরণ আছে।

দয়া-দাক্ষিণ্য

দরিদ্র এবং আর্ত্তের সহায়, দয়ালু দাতা এবং জনহিতৈষী রূপে বিদ্যাসাগরের তুলনা নাই। এই মহদ্‌গুণের জন্য আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং লোকের দুঃখ দুর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আজও তিনি দেশবাসীর নিকট "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" নামে পরিচিত। দুঃস্থ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে তাঁহার আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সাহায্যেই বহু দরিদ্র বিধবার সংসার চলিত। শত শত অনাথ বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হইত। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। শুধু বন্ধু এবং সহকর্ম্মীরাই নয় তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সাহস ছিল অতুলনীয় এবং দাক্ষিণ্য অপূর্ব্ব। অথচ তিনি নিজে নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন। এই তেজস্বী দানবীর সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বড় বড় জমিদারের মাথা আপনি নত হইয়া পড়িত। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর সিসিল বীডন এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাব্রতীর সহিত প্রায়ই পরামর্শ করিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন।

রাজ-সম্মান

অবসরগ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৮০ সালে নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত-গভর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিদানে বিদ্যাসাগর ন'ন সরকার নিজেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে (১৮৬৪, ৪ জুলাই) বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক

সোসাইটির অনারারি মেম্বর—সম্মানিত সভ্য—নির্ব্বাচিত হন।* এই উচ্চসম্মান লাভ এযাবৎকালের মধ্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পলের আমলে তাঁহাকে এই সম্মান-লিপি প্রদান করা হয়—

"বিধবা বিবাহ আন্দোলনের † নেতারূপে তাঁহার আন্তরিকতার এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের অগ্রগামী দলের নায়করূপে তাঁহার মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইহা প্রদত্ত হইল।" (১ জানুয়ারি, ১৮৭৭)।

মৃত্যু

তাঁহার শরীর পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। ক্রমেই তিনি বিশেষরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ-ব্যথা এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রোগভোগে দেহ সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া গেল। তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন। একে একে শ্রমসাধ্য সকল কার্য্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। নগরের কলকোলাহল তাঁহার আর সহ্য হইত না। তিনি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে লাগিলেন। কার্ম্মাটারের বাড়িতেই তিনি বেশী যাইতেন।

শরীর আর বহিল না। ১৮৯১, ২৯এ জুলাই পূর্ণ ৭০ বৎসর বয়সে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

* *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1865, p. 15.

† যাঁহারা বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি :—"A Collection containing the Proceedings which led to the passing of Act xv. of 1856." Compiled by Narayan Keshav Vaidya (Bombay, 1885). বইখানি আমি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীতে দেখি। সুবলচন্দ্র মিত্রের পুস্তকেও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিবরণ আছে।

১৮৯১, ২৭এ আগষ্ট ছোটলাট স্যর চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন-হলে এক বিরাট অধিবেশন হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, ইহাই ছিল সভার আলোচ্য বিষয়। সভার ফলে সেই বিরাট ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের এক প্রস্তরমূর্ত্তি কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশিষ্ট

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী

প্রচারকাল	নাম	বিষয়
(১৮৪২—৪৭)	বাসুদেব-চরিত (অপ্রকাশিত)	শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। ইহাই বিদ্যাসাগরের সর্ব্বপ্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত।
১৮৪৬* ১৯০৩ সংবৎ	বেতালপঞ্চবিংশতি	'বৈতালপচীসী' নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বনে রচিত।
১৮৪৮ ১৯০৪ সংবৎ*	বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ †	মার্শম্যান সাহেবের *History of Bengal*-এর শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনে রচিত। সিরাজ-উদ্দৌলার সিংহাসন-আরোহণ হইতে বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস।
১৮৪৯, সেপ্টেম্বর ১১ ১৭৭১ শক, ২৭ ভাদ্র	জীবনচরিত	চেম্বার্স বায়োগ্রাফি পুস্তকের অনুবাদ। গালিলিও, নিউটন, হর্শেল, ডুবাল, জোন্স প্রভৃতি কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির জীবনচরিত।

* বৃটিশ মিউজিয়মের বাংলা পুস্তকের তালিকায় এই তারিখ দেওয়া আছে।

† রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ' বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫১, এপ্রিল ৬ ১৯০৭ সংবৎ, ২৫ চৈত্র	শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ (বোধোদয়)	নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।
১৮৫১, নভেম্বর ১৬ ১৯০৮ সংবৎ, ১ অগ্রহায়ণ	সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা	
১৮৫১, নভেম্বর ১৬ ১৯০৮ সংবৎ, ১ অগ্রহায়ণ	ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ	পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান।
১৮৫২, মার্চ্চ ৪ ১৯০৮ সংবৎ, ২২ ফাল্গুন	ঋজুপাঠ, ২য় ভাগ	
১৮৫১, ডিসেম্বর ৩০ ১৯০৮ সংবৎ, ১৬ পৌষ	ঋজুপাঠ, ৩য় ভাগ	
১৮৫৩, মার্চ্চ ১০ ১৯০৯ সংবৎ, ২৮ ফাল্গুন	সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত- সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব	১৮৫১, ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত, কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে এই প্রস্তাব প্রথমে পঠিত হয়। অনেকের সবিশেষ অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। সংবৎ ১৯১৩, ১৪ চৈত্র এই প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত হয়।
১৮৫৩	ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ও ২য় ভাগ	
১৮৫৪	ব্যাকরণ কৌমুদী, ৩য় ভাগ	
১৮৫৪, ডিসেম্বর ৯ ১৯১১ সংবৎ, ২৫ অগ্রহায়ণ	শকুন্তলা	কালিদাস-রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের উপাখ্যান-ভাগ।
১৮৫৫, জানুয়ারি ২৮ ১৯১১ সংবৎ, ১৬ মাঘ	বিধবাবিবাহ, প্রথম পুস্তিকা	বিধবা-বিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

১৮৫৫, এপ্রিল ১৩ ১৯১২ সংবৎ, ১ বৈশাখ	বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ	
১৮৫৫, জুন ১৪ ১৯১২ সংবৎ, ১ আষাঢ	বর্ণপরিচয়, ২য় ভাগ	
১৮৫৫, অক্টোবর ২০ ১৯১২ সংবৎ, ৪ কার্ত্তিক	বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক *	বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদ-কারীদের প্রতি উত্তর।
১৮৫৬	কথামালা	Aesop's *Fables* পুস্তকের অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদ।
১৮৫৬, জুলাই ১৫ ১৯১৩ সংবৎ, ১ শ্রাবণ	চরিতাবলী	ডুবাল, রস্কো প্রভৃতি স্বনামধন্য লোকের জীবনচরিত।
১৮৫৯, জানুযারি ১৩ ১৯১৫ সংবৎ, ১ মাঘ	পাঠমালা	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থি বিদ্যার্থিগণের ব্যবহারার্থ জীবন-চরিত, শকুন্তলা ও মহাভারতের অংশ-বিশেষ লইয়া এই পুস্তক সঙ্কলিত।
১৮৬০, জানুযারি ১৩ ১৯১৬ সংবৎ, ১ মাঘ	মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)	উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি মহাভারতের প্রকৃত আরম্ভ ধরিলে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলি উহার উপক্রমণিকা-স্বরূপ। পুস্তকাকারে প্রচারিত করিবার পূর্ব্বে, মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগের এই অনুবাদ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ক্রমশ প্রকাশিত হয়।

* ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' পুস্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ *Marriage of Hindu Widows* নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫, জানুয়ারি মাসে ইহা বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক মারাঠীতেও অনুদিত হয়।

১৮৬১, এপ্রিল ১২ ১৯১৮ সংবৎ, ১ বৈশাখ	সীতার বনবাস	ইহার প্রথম দুই পরিচ্ছেদ ভবভূতি-রচিত 'উত্তরচরিত' নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে গৃহীত। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে সঙ্কলিত।
১৮৬২, ফেব্রুয়ারি ১ ১৯১৮ সংবৎ, ২০ মাঘ	ব্যাকরণ কৌমুদী, ৪র্থ ভাগ	
১৮৬৩, নভেম্বর ১৬ ১৯২০ সংবৎ, ১অগ্রহায়ণ	আখ্যানমঞ্জরী, ১ম ভাগ*	কতকগুলি ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে আখ্যানগুলি রচিত।
১৮৬৪, এপ্রিল ১২ ১৭৮৬ শক, ১ বৈশাখ	প্রভাবতী সম্ভাষণ	বিদ্যাসাগরের পরম প্রিয়পাত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে এই পুস্তিকা রচিত। ১২৯৯ সালের বৈশাখ মাসের 'সাহিত্যে' ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।
১৮৬৮, ফেব্রুয়ারি ১২ ১৯২৪ সংবৎ, ১ফাল্গুন	আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ভাগ	
১৮৬৮	ঐ ৩য় ভাগ	
১৮৬৯	রামের রাজ্যাভিষেক	ইহার মাত্র ছয় ফর্ম্মা মুদ্রিত হইয়াছিল।
১৮৬৯, অক্টোবর ১৫ ১৯২৬ সংবৎ, ৩০ আশ্বিন	ভ্রান্তিবিলাস	শেক্সপীয়ারের *Comedy of Errors*-এর উপাখ্যান-ভাগ।

* চারি বৎসর পরে (১৯২৪ সংবৎ, ১ ফাল্গুন) আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগের মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়া এবং সরল ভাষায় সঙ্কলিত কতকগুলি নূতন আখ্যা দিয়া, 'আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ' প্রচারিত হয়। প্রথম ভাগের পরিত্যক্ত বাকী আখ্যান-গুলির সহিত সাতটি নূতন আখ্যান যোগ করিয়া নামকরণ করা হয়—'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ।'

১৮৭১, জুলাই ১৬ ১৯২৮ সংবৎ, ১ শ্রাবণ	বহুবিবাহ, ১ম পুস্তক	বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
১৮৭২, মার্চ্চ ১৯২৯ সংবৎ, ১ চৈত্র	বহুবিবাহ, ২য় পুস্তক*	বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের মতখণ্ডন।
১৮৭৩ ১৭৯৫ শক	বামনাখ্যানম্	মধুসূদন তর্কপঞ্চানন ১১৭টি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। কিন্তু 'ভাষা-রচনায় তাদৃশ অভ্যাস' না থাকায় 'শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট প্রার্থনা করাতে, তিনি শ্লোকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ও ব্যয়-স্বীকার-পূর্ব্বক পুস্তকখানি মুদ্রিত' করিয়া দেন।
১৮৮৫ ১২৯২ সাল, ১অগ্রহায়ণ	সংস্কৃত-রচনা	বাল্যকালের কতকগুলি সংস্কৃত-রচনা।
১৮৮৮, এপ্রিল ১২ ১২৯৫ সাল, ১ বৈশাখ	নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার শ্বশুর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচিত শিশুশিক্ষা, ১ম—৩য় ভাগের অধিকার লইয়া বিদ্যাসাগর-চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেন। সেই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য বিদ্যাসাগর এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ-সংক্রান্ত পুস্তকখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুস্তকাকারে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার জীবদ্দশায় অল্প অংশই ছাপা হইয়াছিল।

১৮৯০, মে ১৪ ১২৯৭ সাল, ১ জ্যৈষ্ঠ	শ্লোকমঞ্জরী	কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক-সংগ্রহ।
১৮৯১, সেপ্টেম্বর ২৫ ১৯৪৮ সংবৎ, ৯ আশ্বিন	বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত)	এই আত্মজীবনীতে বিদ্যাসাগর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশিত করেন।
১৮৯২, এপ্রিল ২৬ ১২৯৯ সাল, ১৫ বৈশাখ	ভূগোলখগোলবর্ণনম্	১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, জন্ মিয়র নামে পশ্চিম অঞ্চলের এক সিবিলিয়ানের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর পুরাণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ইউরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে ১০০ শ্লোক রচনা করিয়া একশত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। শ্লোকগুলি বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে এখন ৪০৮টি শ্লোক দেখা যায়।
	বাল্মীকির রামায়ণ	টীকাটিপ্পনী সমেত।

১৮৫১, জুলাই ১৬ (১৯০৮ সংবৎ, ১ শ্রাবণ) তারিখে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিবোধ' পুস্তকের অনেকাংশ বিদ্যাসাগরের রচিত। তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে সুরু করেন; অবকাশ-অভাবে শেষে রাজকৃষ্ণবাবুকেই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার ভার দেন। পুত্রগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়,—এই কয়টি প্রস্তাব তাঁহারই রচিত।

'শব্দ-সংগ্রহ'—বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবদ্দশায় বহু খাঁটি বাংলা শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই শব্দ-সংগ্রহ ১৩০৮ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৪-১৩০) প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন :—

১৮৪৮	সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ		
১৮৫৩	কিরাতার্জ্জুনীয়		
১৮৫৩	রঘুবংশ	...	মল্লীনাথের টীকা সমেত
১৮৫৭	শিশুপাল-বধ		
১৮৬১	কুমারসম্ভব	...	মল্লীনাথের টীকা সমেত
১৮৬৯ ১২৯৫ সংবৎ, ৩০ চৈত্র	মেঘদূত	...	ঐ
১৮৭০, আগষ্ট ২২ ১৯২৭ সংবৎ, ৭ ভাদ্র	উত্তরচরিত		
১৮৭১, জুন ১৪ ১৯২৮ সংবৎ, ১ আষাঢ়	অভিজ্ঞানশকুন্তলম		
১৮৮২, নভেম্বর ১৬ ১৯৩৯ সংবৎ, ১ অগ্রহায়ণ	হর্ষচবিত কাদম্বরী		

বিদ্যাসাগর কৃষ্ণনগর রাজবাটীর 'মূলপুস্তক' দেখিয়া ভারতচন্দ্র রায়ের এই কয়খানি গ্রন্থের পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন :—

১৮৪৭ ১৭৬৯ শক	অন্নদামঙ্গল, ১ম খণ্ড
১৮৪৭ ১৭৬৯ শক	অন্নদামঙ্গল [মানসিংহ], ২য় খণ্ড
...	বিদ্যাসুন্দর—দ্বিতীয় মুদ্রণের তারিখ ১৭৭৫ শক (১৮৫৩)

ইহা ছাড়া বিদ্যাসাগর এই তিনখানি সঙ্কলন-গ্রন্থও মুদ্রিত করিয়াছিলেন :—

Selections from the Writings of Goldsmith

Selections from English Literature

Poetical Selections

চারিত্রিক বিশেষত্ব

বিদ্যাসাগরকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে এক দিক দিয়া দেখিলে চলিবে না। 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের করুণার কথা সকলেই জানেন। ওলাউঠা রোগে মুমূর্ষু রোগী পথে পড়িয়া আছে, বিদ্যাসাগর তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, অপরিচিতের দুঃখে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন, বহু অনাথা বিধবার প্রতিপালনে এবং অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রের বই কাপড় ও মাহিনা জোগাইতে মাসে মাসে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন,—এইরূপ বহু কথা সকল জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল কাহিনী হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ যে কত বড় তাহা জানিতে পারি। ফরাসী দেশ হইতে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কবি মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে বলিতেছেন,—"যাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, প্রাচীন ঋষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্ম্মশক্তি, এবং বাঙালী মায়ের হৃদয় দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব গঠিত।"* সত্যই বিদ্যাসাগরের হৃদয় বাঙালী জননীর মতই কোমল ছিল। তাই তিনি কাহারও কষ্ট কাহারও ব্যথা দেখিতে পারিতেন না, তখনই তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বিধবার অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণার প্রতিকারকল্পে তিনি নিজের সকল শক্তি সকল জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছিলেন। করুণ এবং উদারহৃদয় জনহিতৈষী ও সমাজসংস্কারক রূপে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের নিকটই সুপরিচিত। এই দিক দিয়া বিদ্যাসাগরের

---

* "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother."

অপূর্ব্ব জীবনের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমরা সে-সম্বন্ধে বেশী কথা বলি নাই। শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কতটা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনে তিনি কিরূপ শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কথাই আমরা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, এবং এ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে-সকল সরকারী এবং বে-সরকারী চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করিয়াছিলেন তাহারও পূর্ণবিবরণ দিয়াছি। এ-সকল চিঠিপত্রের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই।

ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি। তিনি যে সঙ্কল্প করিতেন তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে এক তিলও বিচ্যুত করিতে পারিত না। তিনি যাহা করিতেন তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়াই করিতেন এবং দূরদর্শী ছিলেন বলিয়া কোনো কাজের ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ধারণা করিয়া লইতেন। অন্যলোক হঠাৎ একটা কিছু বলিয়া তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না, সেজন্য তাঁহাকে একগুঁয়ে মনে করিত। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবন-চরিতে যে-কথা বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে :—

"তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।"

বিদ্যাসাগরের সঙ্কল্প লাট-সাহেবের অনুরোধেও টলে নাই। বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে ঈশ্বরচন্দ্র অপেক্ষা আর কেহ বেশী খাটেন নাই। দেশের লোক হইতে স্বয়ং ছোটলাট পর্য্যন্ত একথা স্বীকার করিতেন।

কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যাইত তাঁহার মাথার উপর একজন-না-একজন সাহেব বিভাগীয় অধ্যক্ষ হইয়া আছে। ছোটলাট হ্যালিডে তাঁহার বন্ধু ছিলেন। সেই হ্যালিডে সাহেবের আমলেও দেখা গেল, প্র্যাট সাহেব ছুটি লইয়া বিলাত গেলেন অথচ ঈশ্বরচন্দ্রকে ইন্‌স্পেক্টার অভ স্কুল্‌স্ করা হইল না। ইহাতে তাঁহার মর্য্যাদাবোধে আঘাত লাগিল। বিদ্যাসাগর পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। ছোটলাট হ্যালিডের বারংবার অনুরোধেও তিনি অটল রহিলেন। সরকারী চাকুরি তিনি আর করেন নাই।

কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত মতবিরোধও তাঁহার চরিত্রের এই দিকটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া ব্যালাণ্টাইনের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাহার উপর তিনি সাহেব। কাজেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি অধিকাংশ বিষয়ে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের সহিত একমত হইয়াও কয়েকটি বিষয়ে নিজের মতামত চালাইবার জন্য মন্তব্য করিলেন। একজন সমপদস্থ ব্যক্তি—কেবল ইংরেজ বলিয়া—তাঁহার উপর মত চালাইবে ইহা বিদ্যাসাগরের সহ্য হইল না। তিনি রিপোর্টের এক কড়া জবাব লিখিলেন এবং তাহাতে আভাস দিলেন, যদি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কাজ করিতে হয় তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। অবশেষে বিদ্যাসাগরেরই জয়লাভ হইল। তিনি নিজের জেদ সম্পূর্ণ বজায় রাখিলেন।

বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ জেদী। পিতাও বালক-পুত্রের চরিত্রের এই বিশেষত্ব বুঝিয়া চলিতেন। এই বিশেষত্ব বরাবর বজায় ছিল। এইরূপ জেদ কিন্তু কোনো অন্যায় কাজে কখনও প্রযুক্ত হয় নাই। দৃঢ়চিত্ততা তাঁহার চরিত্রকে মহান্ করিয়া তুলিয়াছে। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন তাঁহার দুর্জ্জয়

দৃঢ়চিত্ততার আর একটি উদাহরণ। দেশের সমগ্র রক্ষণশীল শক্তি সংহত হইয়াও তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। জীবন বিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সঙ্কল্প টলে নাই। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন কোনো ইংরেজীওয়ালা এই সংস্কারে হাত দিলে তেমন কিছু বলিবার থাকিত না; কিন্তু একজন অধ্যাপক পণ্ডিতের পক্ষে এরূপ কার্য্যে অগ্রণী হওয়া সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই কাজটিকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া মনে করিতেন। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি এক পত্রে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখিতেছেন,—

"বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই।* ...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

বিদ্যাসাগর যাহা ধরিতেন তাহা ঐকান্তিকভাবে সম্পন্ন করিতেন। বাধা-বিঘ্ন, বিরোধ, অভাব তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার গুরুভার যখন তিনি স্কন্ধে বহন করিতেছেন, নিজের দায়িত্বে তখন তিনি গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ভারত-সরকারের শেষ সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। সরকার এ-বিষয়ে তাঁহার ঋণ

* বিধবা-বিবাহ ও বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে বাদশাহ আকবর বলিতেন—"শৈশব-বিবাহ ভগবানের চক্ষে অপ্রীতিকর, কেন-না বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই দূরে রহিল। তদ্ব্যতীত ইহা ক্ষতিকর। যে-ধর্ম্মে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ, সেখানে কষ্ট গভীর।" "Happy Sayings of Akbar," *Ain-i-Akbari*, iii. 397.

পরিশোধ করিতে অবশেষে সম্মত হইলেও তাঁহাকে যে যথেষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবুও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার আগ্রহ কিছুমাত্র কমে নাই।

নারীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া নারীজাতির উন্নতি ও দুঃখ লাঘবের জন্য সকল অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বীটন কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে-কোনো কার্য্য তাহার উদাহরণ।

একদিকে তাঁহার প্রবৃত্তি যেমন বলিষ্ঠ ছিল অন্যদিকে তাঁহার স্বভাব ছিল তেমনি কোমল ও সরল। তাই শত্রু-মিত্র সকলেরই তিনি প্রশংসাভাজন ছিলেন।

নানারূপ সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেও বেশভূষায় আচারে-ব্যবহারে তিনি কখনও সাহেবদের নকল করেন নাই।—

"ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ চর্ম্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না।" *

* "বিদ্যাসাগর চরিত"—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধনা—ভাদ্র, ১৩০২, পৃ ৩০৯

সামাজিক বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ঔদার্য্য ছিল। কাহাকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না, কাহাকেও তিনি হীন বলিয়া মনে করিতেন না। সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন, বড়লোক ছোটলোক অথবা উচ্চজাতি অবর জাতি বাছিতেন না। নিজেকেও তিনি কাহারও কাছে খাটো করিতেন না। যে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত তাহার সহিত তিনি সদ্ব্যবহার আচরণ করিতেন, এবং যে তাঁহার প্রতি অসম্মানের সহিত ব্যবহার করিত, ইংরেজ অথবা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইলেও তিনি তাহার প্রতি অনুরূপ আচরণ করিতে ছাড়িতেন না। এইখানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কথাগুলি মনে পড়ে ঃ--

"তিনি [বিদ্যাসাগর] এক সময়ে নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাসুদ্ধ পায়ে ঠক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।' আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।"*

সামাজিক আচরণে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। সব জিনিষ তিনি যুক্তি দিয়া পরখ করিতেন। 'শাস্ত্রে আছে'—ইহাই তাঁহার কাছে শেষকথা ছিল না। তাঁহার মতামত খুব স্পষ্ট ছিল। এমন কি বেদান্তকে তিনি ভ্রান্ত দর্শন বলিতেন।

তিনি নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। সমাজ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বড়-একটা যোগ দিতেন না।

* "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ. ২০৮

কিন্তু শিক্ষা ও সমাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি নিজের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ছেলেরা ভবিষ্যতে যাহাতে ভাল বাংলা লেখক ও সাহিত্যস্রষ্টা হইতে পারে, তিনি এমনভাবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সংস্কৃত ও ইংরেজী, এই উভয় ভাষায় ভালরূপ ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে, কেহ ভাল বাংলা লেখক হইতে পারে না। তাই ইংরেজী বিদ্যার প্রসাদগুণ এবং সংস্কৃতের ভাষাসম্পৎ তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট।

বিদ্যাসাগরের আর একটি গুণ ছিল—তাঁহার লোক-নির্ব্বাচনের অদ্ভুত ক্ষমতা। এই গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সহজ হইয়াছিল। দু-একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর* প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সুবিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে (১৪ জুন, ১৮৬১) তাঁহার নিঃসহায় পরিবার-বর্গের মুখ চাহিয়া, বিদ্যাসাগরের অনুরোধে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কাগজখানি ও ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়া লন। হরিশবাবুর মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি অল্পদিন মাত্র কাগজখানির সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। শেষে সিংহ-মহাশয় কাগজ চালাইবার সমুদয় ভার বিদ্যাসাগরের হাতে দেন।

"এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ণদাস পালের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া হইল। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে

* ১৮৫৩ সালের জানুয়ারী (?) মাসে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রকাশ :---

"মাঘ, ১২৫৯।...হিন্দু পেট্রিয়ট নামক সাপ্তাহিক ইংরাজি পত্র প্রকাশারম্ভ হয়।"---সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩)।

অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাস তখন বালক। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রবন্ধাদি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া, হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে লাগিলেন।...কৃষ্ণদাস এইরূপে কিয়দ্দিনের জন্য বিদ্যাসাগরের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের কার্য্য করেন। একথা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন।...কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকতা প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় চাকরি করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত।"*

দেখা যাইতেছে বিদ্যাসাগরের লোক চিনিতে ভুল হয় নাই। 'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম বাহির করেন (১৮৫৮, নভেম্বর)।† তখনকার দিনে এরূপ উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল না।

---

* "কৃষ্ণদাস পালের জীবনী"---শ্রীরামগোপাল সান্যাল। (১৮৯০) পৃ. ২৭-৩০। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন,---"কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি তলায় তলায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যদিগকে উক্ত কাগজের স্বত্বাধিকারী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব হইতে লাগিল যে, হিন্দু পেট্রিয়ট বিদ্যাসাগরের অধীনে না রাখিয়া উহা কতিপয় ট্রাষ্টির হস্তে সমর্পিত হউক। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বিদ্যাসাগরের নিকট কে করিবে এই বিষম সমস্যা প্রস্তাবকারীদিগের মনে উদিত হইল। এই কথা চালাচালি হইতে হইতে বিদ্যাসাগর সময় পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট এই প্রস্তাব হইতেছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর এইরূপ লুকাচুরির মধ্যে থাকিবার লোক নহেন। তিনি অবিলম্বে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন।" (পৃ. ৩০-৩১)

† চাংড়িপোতা দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে ৪র্থ ভাগ হইতে কয়েক বৎসরের 'সোমপ্রকাশের' ফাইল আছে।

যাহা ছিল তাহাতে রাজনৈতিক বিষয়, অথবা ধীরভাবে কোনো সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক বিষয় আলোচিত হইত না। অল্পদিন পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হস্তে সোমপ্রকাশের ভার অর্পণ করেন। এখানেও তাঁহার বিবেচনায় কোনো ভুল হয় নাই।

বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন। লোকে তাঁহার কথাবার্ত্তা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। রসিকতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় জীবনের অপরাহ্ণে তাঁহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "সে আমার নিন্দে করলে কেন, আমি ত তা'র কোনো উপকার করিনি"—এইরূপ তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ কথা তাই তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাই।

বিদ্যাসাগরের কর্ম্মশক্তি ছিল অপূর্ব্ব। কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্ত হইত। তিনি ভাবুকের ন্যায় শুধু স্বপ্ন দেখিতেন না,—তিনি কাজের লোক ছিলেন। তাই যে-কাজ অন্যের কাছে প্রায় অসম্ভব ছিল, সেই কাজকেই তিনি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বিরাট পুরুষ ছিলেন।

"বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শত সহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহান্ চরিত্রের যে অক্ষয়বট বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা নিষ্ফল

আড়ম্বর ভুলিয়া সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত, দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্যবীর্য্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

ওঁ।

বিদ্যাসাগর চরিত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধনা—ভাদ্র ১৩০২।

পরিশিষ্ট

এই পুস্তক মুদ্রণকালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা পাঠ করিবার সুবিধা হয়। তাহাতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাইয়াছি নিম্নে ... করিলাম :—

(২০ মে ১৮৫২। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৯)

আমরা কোন বন্ধু বিশেষের দ্বারা অবগত হইয়া অত্যন্ত খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, কয়েক দিবস হইল, আমারদিগের সদ্বিদ্বান্ বন্ধু সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজ গ্রাম রাধানগরের সান্নিধ্য দশুনার বাটীতে একদল দস্যু প্রবেশ পূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

(১২ এপ্রিল ১৮৫৬। ১ বৈশাখ ১২৬৩)

ফাল্গুন, ১২৬২।...পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুকালেজের সহকারিণী বাঙ্গালা পাঠশালার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকদিগকে ইংরাজী পুস্তকের উপদেশ দিবার নিয়ম করেন।

(১৪ এপ্রিল ১৮৫৭। ৩ বৈশাখ ১২৬৪)

সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপেল শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কালেজের ইংরাজী ডিপার্টমেন্টে অধিক ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্তকরণ প্রার্থনায় গভর্ণমেণ্টে অনুরোধ করাতে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত-কালেজে পূর্ব্বে যে প্রকার সংস্কৃত বিদ্যার পাঠনা হইত, এইক্ষণে আর তদ্রূপ হয় না, ইংরাজী পাঠনাই অধিক হইতেছে, বোধ হয় অতঃপর সংস্কৃতবিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠনাকার্য্য এককালে উঠিয়া যাইবেক।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

জহান্‌-আরা (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ১৷৹

শাজাহান বাদশার কন্যা জহান্‌-আরার অসীম পিতৃভক্তি, অতুলনীয় দান, অপরিমেয় জ্ঞান-পিপাসা চিরদিন তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল ও অমর করিয়া রাখিবে।

স্যর যদুনাথ সরকার লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত।

বেগম সমরু (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল

এই প্রাচ্য-মহিলার অমানুষী প্রতিভা, অসামান্য প্রভুত্ব, অপরিমেয় দা[illegible]তা, সর্ব্বোপরি রণস্থলে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা পাঠ করিলে বিস্ময়ের উ[illegible]রে। আটখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র শোভিত।

দিল্লীশ্বরী মূল্য ॥৹

সম্রাজ্ঞী রাজিয়া ও 'জগজ্জ্যোতি' নূরজাহানের অপূর্ব্ব জীবন-কথা অতি সরস করিয়া লিখিত।

স্যর যদুনাথ সরকার :—"এই গ্রন্থখানিতে রাজিয়া ও নূরজাহানের সম্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে।...এই কঠোর ইতিহাস-সাধনার ফল বেশ মনোরম হইয়াছে।...এটা বঙ্গভাষার কম গৌরবের বিষয় নহে যে, নূরজহানের সম্পূর্ণ ও ইতিহাস-সঙ্গত জীবনী প্রথমে এই ভাষাতে লিখিত হইয়াছে।...এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক।"

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা মূল্য ॥৵৹

রঙমহলেও যে কাব্যনিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা যে শুধু বিলাস-বাসনের লীলাভূমি ছিল না, এই পুস্তক-পাঠে তাহা বিশেষ করিয়া জানা যাইবে।

স্যর যদুনাথ সরকারের লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা।

মোগল-বিদুষী (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ॥৵৹

ইহাতে মোগল-অন্তঃপুরের উজ্জ্বল রত্ন জেব-উন্নিসা ও গুলবদনের চরিত কথা সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি :—"এরূপ পুস্তক দ্বারা বাংলা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সোপানও নির্ম্মিত হইতেছে।"

বাঙ্গলার বেগম (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ॥৹

প্রাপ্তিস্থান :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী

ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা তিনখানি মজাদার ইতিহাসের গল্পের বই। চিত্রশিল্পী শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা রঙীন মলাট; পাতায় পাতায় ছবি।

রাজা-বাদশা (দ্বিতীয় ভাগ)	...	মূল্য ।।০
শিবাজী-মহারাজ	...	" ৸০
কেল্লা-ফতে	...	" ।।০
রণ-ডঙ্কা	...	" ৸০

প্রাপ্তিস্থান :—এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা